Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীদের দাওয়াত কেমন ছিল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ তানিয়া সুলতানা

রোলঃ 23090120267

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীদের দাওয়াত কেমন ছিল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ তানিয়া সুলতানা

রোলঃ 23090120267

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নবীদের দাওয়াত কেমন ছিল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছাঃ তানিয়া সুলতানা, আইডিঃ 23090120267 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নবীদের দাওয়াত কেমন ছিল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মোছা: তানিয়া সুলতানা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মোছাঃ তানিয়া সুলতানা

আইডিঃ 23090120267

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র **পৃষ্ঠা নং**

অধ্যায় - ১. ভূমিকা	5
গবেষণার পটভূমি	5
বিষয় নির্বাচনের যৌক্তিকতা	7
গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	7
গবেষণা পদ্ধতি (কুরআন, হাদীস)	8
অধ্যায় - ২. দাওয়াতের ধারণা	9
দাওয়াতের সংজ্ঞা: ভাষাগত ও পরিভাষাগত অর্থ	9
ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব (কুরআন-হাদীস)	13
দাওয়াত ও নবুয়তের সম্পর্ক	19
অধ্যায় - ৩. নবীদের দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য	22
তাওহীদের দিকে আহ্বান	22
আখিরাতের প্রতি সতর্ক করা	25
শিরক, কুফর ও মিথ্যা প্রথা পরিহারের আহ্বান	28
ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে দাওয়াত	32
অধ্যায় - ৪. বিভিন্ন নবী র দাওয়াতের রূপ	37
হযরত আদম আঃ	37
হযরত শীস আঃ	41
হযরত নূহ আঃ	43
হযরত হূদ আঃ	45
হযরত সালিহ আঃ	48
হযরত ইব্রাহীম আঃ	51
হযরত লূত (আঃ)	54

হযরত ইসমাঈল (আঃ) 56

হযরত মূসা (আঃ) 58

হযরত হারুন (আঃ) 60

হযরত ঈসা (আঃ) 62

হযরত মুহাম্মদ ﷺ 65

অধ্যায় - ৫. দাওয়াতের পদ্ধতি ও কৌশল 70

প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ ও যুক্তি তর্কের মাধ্যমে দাওয়াত 70

বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বোঝানো 76

কঠিন পরিস্থিতিতেও দৃঢ়তা 78

শিষ্টাচার, দয়া ও সহমর্মিতা 79

অধ্যায় - ৬. নবীদের দাওয়াতের চ্যালেঞ্জ 81

অবিশ্বাসীদের বিরোধিতা 81

মিথ্যা অভিযোগ, উপহাস ও নির্যাতন 83

সাময়িক ব্যর্থতা ও হতাশা 85

আল্লাহর সাহায্য ও চূড়ান্ত সাফল্য 88

অধ্যায় - ৭. দাওয়াত দানে নবীদের বিশেষ সিফাত (গুণাবলি) 90

অধ্যায় - ৮. উপসংহার 100

অধ্যায় - ৯. তথ্যসূত্র 101

ভূমিকা

গবেষণার পটভূমি

আলহামদুলিল্লাহ।

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের পালনকর্তা। আমি তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা চাইছি। আমার নফসের অনিষ্টতা ও আমলের অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্য আমি তাঁরই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যাকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দান করেন, তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না, আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন, তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই; তিনি এক ও অদ্বিতীয়। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি মানুষকে আল্লাহর একত্বের দিকে আহ্বান করেন, কল্যাণের দিকে উৎসাহিত করেন এবং শিরক ও কুফর থেকে দূরে রাখেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবার ও সাহাবাদের প্রতি, এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি।

আল্লাহর রাসূলগণ মানবজাতির পথপ্রদর্শক। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক যুগে এমন নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন, যারা মানুষকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছেন। তাঁদের দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল তাওহীদ প্রতিষ্ঠা, শিরক ও কুফর থেকে বিরত থাকা, এবং সৎকর্মে উৎসাহ প্রদান। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে অবহিত করতেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার পথ দেখাতেন।

নবীদের দাওয়াতের মধ্যে ছিল এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও দয়া। তাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে, প্রতিকূলতার মধ্যেও, মানুষকে একমাত্র আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন। যেমন, হযরত নূহ (আঃ) নয় শতাধিক বছর দাওয়াত দিয়েছিলেন, তবুও অবিচল ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যুক্তি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। আর সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবজাতির জন্য সর্বজনীন দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন যা কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে।

আল্লাহ তাআলার অশেষ অনুগ্রহ যে, আমি তাঁর তাওফিকেই এই বিষয়ের ওপর গবেষণা করার সুযোগ পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, সব প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য।

নবীদের দাওয়াত মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়। তাঁরা শুধুমাত্র দাওয়াতদাতা ছিলেন না; বরং সমাজ সংস্কারক, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী এবং মানবতার রক্ষক ছিলেন। তাঁদের আহ্বান ছিল সর্বজনীন যা জাতি, বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা ভৌগোলিক সীমানার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সমগ্র মানবজাতির প্রতি নির্দেশিত। নবীদের দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষ জানতে পেরেছে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতা, এবং আল্লাহর নির্দেশ মেনে চললেই প্রকৃত শান্তি, সাফল্য ও মুক্তি অর্জন সম্ভব।

নবী-রাসূলদের দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল তাওহীদ। এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও একমাত্র তাঁর ইবাদতে আত্মনিয়োগ। তাঁরা মানুষকে শিরক ও কুফরি থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন এবং মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী চলার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। নবীরা মানুষকে শুধু আখিরাতের মুক্তির বার্তা দেননি, বরং দুনিয়াবি জীবনে ন্যায়বিচার, সততা, দয়া, ভ্রাতৃত্ব ও সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠার পথও দেখিয়েছেন। তাঁদের দাওয়াত সমাজে নৈতিক পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিল যা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অন্যায়ে নিমজ্জিত জাতিগুলোকে আলোর পথে ফিরিয়ে এনেছিল।

নবী-রাসূলদের দাওয়াতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল হিকমাহ (প্রজ্ঞা) ও ধৈর্য, তাঁরা কখনো কঠোরতা বা রূঢ়তার আশ্রয় নেননি; বরং নরম ভাষা, যুক্তি, বাস্তব উদাহরণ এবং নৈতিক উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করেছেন। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন; “তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।”

এই আয়াত নবীদের দাওয়াতের মৌলিক নীতি ও আদর্শ তুলে ধরে, যেখানে জ্ঞান, যুক্তি, প্রজ্ঞা ও সহনশীলতা একত্রে মিশে আছে। নবীরা জানতেন যে দাওয়াতের সফলতা নির্ভর করে ধৈর্য ও প্রজ্ঞার উপর। তাই তাঁরা কঠিন পরিস্থিতি, উপহাস, নির্যাতন ও বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজেদের দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হননি।

হযরত নূহ (আঃ) নয় শতাধিক বছর দাওয়াত প্রদান করেছেন, অথচ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল অল্প সংখ্যক মানুষ; তবুও তিনি অবিচল ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) যুক্তি ও তর্কের মাধ্যমে তাওহীদের সত্যতা প্রকাশ করেছেন। হযরত মূসা (আঃ) ফেরআউনের মতো নির্যাতনকারী শাসকের সম্মুখে সাহসের সঙ্গে সত্যের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। আর সর্বশেষ নবী ও রাসূল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সর্বজনীন দাওয়াতের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহর চূড়ান্ত বাণী পৌঁছে দিয়েছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

এই গবেষণায় নবীদের দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য, পদ্ধতি, কৌশল ও নীতিমালা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা হবে

নবীদের দাওয়াতের বিষয়বস্তু ও মূল বার্তা কী ছিল,

তাঁরা কীভাবে প্রতিকূল ও প্রতিরোধমূলক পরিবেশেও অবিচল থেকে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে গেছেন,

এছাড়াও, গবেষণায় দাওয়াতের ক্ষেত্রে নবীদের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জ, তাদের সহনশীলতা ও দাওয়াতি নীতির ফলাফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হবে যে, নবীদের দাওয়াত শুধু ধর্মীয় আহ্বানই নয়; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ মানবিক, নৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের ভিত্তি ছিল।

বিষয় নির্বাচনের যৌক্তিকতা

নবীদের দাওয়াত মানব ইতিহাসের এক অনন্য ও আলোকিত অধ্যায়। আল্লাহ তাআলা নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে মানবজাতিকে সঠিক পথে আহ্বান করেছেন, যাতে মানুষ তাওহীদের বার্তা গ্রহণ করে, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে এবং অন্যায় ও গোমরাহী থেকে দূরে থাকে। নবীদের দাওয়াতের মূল লক্ষ্য ছিল মানবজীবনে আল্লাহর নির্দেশনা প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজে নৈতিকতা, সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তি সুদৃঢ় করা। তাঁদের দাওয়াত ছিল প্রজ্ঞা, ধৈর্য, দয়া ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে পরিচালিত যা প্রতিটি যুগের মানুষের জন্য আদর্শ ও পথনির্দেশক হিসেবে বিবেচিত।

বর্তমান বিশ্বে মানবতা, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার যে সংকট দেখা দিয়েছে, তার প্রেক্ষাপটে নবীদের দাওয়াত ও জীবনদর্শন পুনরায় অনুধাবন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আধুনিক সভ্যতার বাহ্যিক জৌলুসের আড়ালে মানুষ ক্রমশ বস্তুবাদ, অন্যায় ও অনৈতিকতার গভীরে নিমজ্জিত হচ্ছে। এই বাস্তবতায় নবীদের দাওয়াতের আদর্শ ও শিক্ষণীয় দিকসমূহ মানুষকে পুনরায় সৎপথে ফিরিয়ে আনার একমাত্র কার্যকর দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

এই গবেষণার মাধ্যমে নবীদের দাওয়াতের পদ্ধতি, নীতি, কৌশল ও শিক্ষণীয় দিকগুলো বিশ্লেষণ করা হবে, যা সমকালীন সমাজে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি বাস্তবধর্মী দিকনির্দেশনা হিসেবে প্রয়োগযোগ্য। তাই ‘‘নবীদের দাওয়াত কেমন ছিল’’ এই বিষয়টি গবেষণার জন্য সম্পূর্ণ যৌক্তিক, প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো নবী ও রাসূলগণের দাওয়াতের পদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য, চ্যালেঞ্জ ও সফলতা বিশ্লেষণ করা। তাঁদের দাওয়াত কেমন ছিল, কীভাবে তাঁরা মানুষকে আহ্বান করতেন, কেমন কৌশলে অবিশ্বাসীদের মুখোমুখি হতেন এবং কীভাবে তাঁদের দাওয়াতের মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন এসেছিল এসব বিষয়ে গভীরভাবে অনুধাবন করাই এই গবেষণার মূল লক্ষ্য।

গবেষণা পদ্ধতি (কুরআন, হাদীস)

এই গবেষণায় নবীদের দাওয়াতের স্বরূপ, পদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষণীয় দিকসমূহ বিশ্লেষণের জন্য মূলত ধর্মীয় উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার প্রাথমিক ও প্রধান উৎস হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহ গ্রহণ করা হয়েছে।

কুরআন নবীদের দাওয়াতের মূল নির্দেশনা ও প্রমাণ। গবেষণায় বিভিন্ন আয়াত বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে নবীরা মানুষের উদ্দেশ্যে আহ্বান, সতর্কতা এবং নৈতিক শিক্ষা প্রদান করেছেন। কুরআনের ভাষা ও প্রাসঙ্গিক বাণী থেকে নবীদের দাওয়াতের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও সামাজিক প্রভাব উদ্ভাসিত করা হয়েছে।

হাদিসসমূহ নবীদের জীবন ও দাওয়াতের বিস্তারিত চিত্র উপস্থাপন করে। গবেষণায় সহিহ বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি, আবু দাউদ এবং অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য হাদিস সংকলন থেকে নবীদের দাওয়াতের কার্যকলাপ, ধৈর্য, কৌশল ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উপরোক্ত মূল উৎসের পাশাপাশি বিভিন্ন ইসলামি ঐতিহাসিক ও ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে নবীদের দাওয়াতের প্রেক্ষাপট, সামাজিক প্রভাব ও ইতিহাসগত বিশ্লেষণ করা যায়। এ ধরনের গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

কাসাসুল আম্বিয়া (নবীদের জীবনী ও দাওয়াতের বিশদ বিবরণ),

বিদায়া আন নিহায়া (ইতিহাস ও নবীদের দাওয়াতের প্রভাব),

সিরাহ গ্রন্থসমূহ (যেমন: ইবনু ইসহাক, ইবনু হাসান ইবনু শাহাব সিরাহ),

তাফসির গ্রন্থসমূহ (যেমন: তাফসির ইবনু কাসীর, তাফসির তাবারি, তাফসির আল-কুরআন আল-আজীম),

অন্যান্য ইসলামী গবেষণা ও দাওয়াতী সাহিত্য, যা নবীদের দাওয়াতের নীতি, কৌশল এবং শিক্ষণীয় দিকগুলো বিশ্লেষণে সহায়ক।

গবেষণার পদ্ধতি - গবেষণাটি মানবিক-ধর্মীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে। এতে কুরআন, হাদিস এবং অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ, শ্রেণীবদ্ধকরণ ও বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নবীদের দাওয়াতের পদ্ধতি, নীতি এবং শিক্ষণীয় দিকগুলো স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল সমকালীন সমাজে নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যবহারযোগ্য দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

দাওয়াতের ধারণা

দাওয়াতের সংজ্ঞা: ভাষাগত ও পরিভাষাগত অর্থ

দাওয়াহ শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর দিকে ডাকা, রবের পথে ডাকা। আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর হুকুমে, আল্লাহ যেভাবে দেখিয়েছেন সেভাবে মানুষ কে আল্লাহর পথে ডাকা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নবুয়াত প্রাপ্ত হওয়ার পর দাওয়াতের কাজ শুরু করেন অত্যন্ত হিকমাহ (জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা) ও ধীরে ধীরে প্রসারের নীতিতে। তাঁর দাওয়াতের সূচনা হয়েছিল নিজের নিকটতম পরিবার থেকে, এরপর ধাপে ধাপে তা বিস্তৃত হয় গোটা সমাজে। প্রথমে নবী করিম ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্তির পর এই মহান বার্তা কাউকে জানাননি; কারণ তখন তিনি নিজেই গভীর চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে ছিলেন। কিছু সময় পর, যখন তাঁর অন্তর সম্পূর্ণভাবে প্রশান্ত ও দৃঢ় হয়ে ওঠে, তখন তিনি দাওয়াতের কাজ শুরু করেন তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষদের দিয়ে।

সবচেয়ে আগে নবী করিম ﷺ তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রাঃ)-কে ইসলাম গ্রহণে আহ্বান করেন। তিনি বিনা দ্বিধায় নবীজির কথায় ঈমান আনেন। তিনিই প্রথম মুসলিম নারী। নবীর কষ্টের সময়ে তিনি ছিলেন তাঁর সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা ও সহায়।

এরপর নবী ﷺ দাওয়াত দেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবু বকর (রাঃ)-কে। তিনি বিনা প্রশ্নে নবীর আহ্বানে সাড়া দেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে তাঁর দাওয়াতের মাধ্যমেই উসমান (রাঃ), আবদুর রহমান ইবন আওফ (রাঃ), তালহা (রাঃ), যুবায়ের (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেন।

নবী ﷺ এরপর দাওয়াত দেন তাঁর ছোট চাচাতো ভাই আলী (রাঃ)-কে, যিনি তখন কিশোর ছিলেন এবং নবীজির ঘরেই থাকতেন। তিনি রাতে ভেবে সকালে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম মুসলিম শিশু।

এরপর নবী ﷺ তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ), ফুফু সাফিয়া (রাঃ) এবং অন্যান্য আত্মীয়দের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। কেউ কেউ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেন, কেউবা বিরোধিতা করেন।

যখন নবী ﷺ দেখলেন যে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে কিছু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন তিনি দাওয়াতের পরিধি বাড়িয়ে সাধারণ জনগণের মাঝে আহ্বান শুরু করেন। প্রথমে তা ছিল গোপনে যেখানে খুব অল্প কিছু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতেন। তিন বছর গোপনে দাওয়াত দেওয়ার পর আল্লাহর আদেশে তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াত শুরু করেন।

দাওয়াতের ভাষাগত অর্থ

আরবি শব্দ اَلدَّعْوَةُ (আদ্-দা'ওয়াহ) শব্দটি دَعَا (দা'য়া) ক্রিয়াপদ থেকে উদ্ভূত। দা'য়া শব্দের মূল অর্থ হলো - ''ডাকা'', ''আহ্বান করা'', ''অনুরোধ করা'' বা '' আহ্বান জানানো''

অতএব, ভাষাগতভাবে ''দাওয়াত'' বলতে বোঝায় কাউকে কোনো বিষয়ে আহ্বান বা ডাকা।

দাওয়াতের পরিভাষাগত অর্থ

পরিভাষাগতভাবে (ইসলামী অর্থে) ''দাওয়াত'' বলতে বোঝায় -

মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা, তাওহীদ, ঈমান, সৎকাজ ও ন্যায়ের দিকে ডাকা এবং শিরক, কুফর ও অন্যায় থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা।

ক) ইবন তায়মিয়া (রহ.) বলেন:

".الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما أمر به، والنهي عما نهى عنه"

"আল্লাহর দিকে দাওয়াত হলো মানুষকে তাঁর প্রতি ঈমান আনার এবং যা আদেশ করেছেন তা মানার আহ্বান, আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত রাখার আহ্বান।" [1]

(খ) ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন:

".الدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل وأتباعهم، وهي دعوة الخلق إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة"

"আল্লাহর পথে দাওয়াত হলো নবী-রসূল ও তাদের অনুসারীদের কাজ; যা মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথে আহ্বান করে।" [2]

কুরআনের দৃষ্টিতে দাওয়াতের ধারণা:

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ

অর্থ: "তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে।" [3]

এই আয়াতে "ٱدْعُ" (আহ্বান কর) ক্রিয়াটি থেকেই "দাওয়াত" শব্দের মূল ধারণা প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে দাওয়াহ শব্দের ব্যবহার এসেছে।

যেমন উল্লেখযোগ্য আয়াত

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

"আর যখন আমার বান্দারা তোমার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে, তোমাকে বলি, আমি তাদের কাছে কাছে আছি; আমি সেই আহ্বানকারীর আহ্বান শুনি যখন সে আহ্বান করে" [4]

এই আয়াতে "دَعْوَةَ" (আহ্বান/দাওয়াত) শব্দ রয়েছে।

[5] أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوٓ إِلَى الدَّارِ السَّلَـٰمِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

[1] (মাজমু আল ফাতওয়া , ২৮:২৩১)

[2] (জাদ আল মাআদ, ১:৬৯)

[3] (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৫)

[4] সুরা আল-বাকারা (২:১৮৬)

[5] সুরা আল-বাকারা (২:২২১)

এখানে “يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ” এবং “يَدْعُوْ إِلَى الدَّارِ السَّلَمِ” ইত্যাদি রূপে দাওয়াত সম্পর্কিত শব্দ আছে।

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থঃ আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।[6]

এখানে “يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ” - যা দাওয়াত/আহ্বান করার কথা নির্দেশ করে।

وَاللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَىٰ دَارِ السَّلَٰمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

অর্থঃ আর আল্লাহ শান্তি-নিরাপত্তার আলয়ের প্রতি আহবান জানান এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথ প্রদর্শন করেন।[7]

এখানে “يَدْعُو” আল্লাহর দ্বারা আহ্বানের কথা বলা হয়েছে।

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ اتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ اللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

অর্থঃ বলে দিনঃ এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।[8]

এখানে “أَدْعُوْ” - আমি আহ্বান করি - শব্দটি রয়েছে।

قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِۦٓ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَـَٔابِ

অর্থঃ বলুন, আমাকে এরূপ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, আমি আল্লাহর এবাদত করি। এবং তাঁর সাথে অংশীদার না করি। আমি তাঁর দিকেই দাওয়াত দেই এবং তাঁর কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন।[9]

এখানে “أَدْعُوْ” - আমি আহ্বান করি শব্দটি আছে।

কুরআনে বহু স্থানে “দাওয়াত” শব্দটি বা এর মূল ক্রিয়াপদ (دعا – يدعو) বিভিন্ন অর্থ ও প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনও এটি এসেছে আল্লাহর পথে আহ্বান বোঝাতে, কখনও ঈমান ও সৎকর্মের দিকে ডাকা অর্থে, আবার কোথাও কুফর ও অবাধ্যতার প্রতি সতর্কতা হিসেবে। নবী ও রাসূলগণকে আল্লাহ তাআলা দাওয়াতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, যেন তারা মানুষকে তাওহীদের পথে আহ্বান করেন এবং শিরক ও অন্যায় থেকে বিরত রাখেন।

[6] আল ইমরান (৩: ১০৪)

[7] ইউনুস - (১০: ২৫)

[8] ইউসুফ – (১০: ১০৮)

[9] আর রা'দ – (১৩: ৩৬)

কুরআনে ‘‘দাওয়াত’’ শব্দটি শুধু আহ্বান নয়, বরং এটি নবুওয়াত ও রাসালতের মূলে থাকা এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি নবীকে মানুষের মাঝে প্রেরণ করেছেন দাওয়াতের মিশন নিয়ে মানুষকে আল্লাহর একত্বে আহ্বান করার জন্য। কুরআনে দাওয়াতকে হিকমত, উত্তম উপদেশ ও ন্যায়সংগত তর্কের মাধ্যমে পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এভাবে দাওয়াত শুধু একটি কাজ নয়, বরং এটি আল্লাহর বান্দাদের প্রতি করুণা ও হিদায়াত পৌঁছানোর সর্বোত্তম উপায়।

কুরআনে দাওয়াত-এর গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এটি ইসলামি দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রাণভিত্তি। আল্লাহ তাআলা কুরআনের বহু স্থানে নবী ও মুমিনদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা মানুষকে তাঁর পথে আহ্বান করে। দাওয়াতের মাধ্যমেই সত্য ও অসত্যের পার্থক্য স্পষ্ট হয় এবং মানবজাতি অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরে আসে।

দাওয়াতের মাধ্যমে সমাজে নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা পায়, আর অন্যায়, জুলুম ও কুফর দূর হয়। কুরআনে নবীদের জীবনীতে দাওয়াতের শিক্ষা প্রতিটি যুগের মানুষের জন্য আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ

অর্থাৎ, ‘‘আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর কথার চেয়ে উত্তম আর কার কথা হতে পারে?’’ [10]

অতএব, দাওয়াত কেবল একটি ধর্মীয় আহ্বান নয়, বরং এটি মানবতার কল্যাণে আল্লাহপ্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্ব ও ইবাদতের একটি রূপ।

[10] সূরা ফুসসিলাত (৪১:৩৩)

ইসলামে দাওয়াতের গুরুত্ব (কুরআন-হাদীস)

ইসলামে দাওয়াতের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ। দাওয়াত মানে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা, সত্য ও ন্যায়ের দিকে ডেকে আনা, এবং মিথ্যা, অন্যায় ও কুসংস্কার থেকে দূরে রাখা। এটি নবী ও রাসূলদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন ,

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমাহ ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে।" [11]

এই আয়াত প্রমাণ করে যে দাওয়াতের কাজ কেবল নবীদের জন্যই নয়, বরং প্রতিটি মুসলমানের জন্যও এক মহান দায়িত্ব। দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষ সত্যের পথে ফিরে আসে, সমাজে ন্যায়, সততা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। নবী মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সমগ্র জীবনে দাওয়াতকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কিরামও এই দাওয়াতের কাজ বিশ্বজুড়ে পৌঁছে দিয়েছেন।

আমরা শুধু নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকলে পার পেয়ে যাবো না। কারণ নবুওতের ধারা বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং দাওয়াহ এর দায়িত্ব উম্মতে মোহাম্মদীর উপরে ন্যাস্ত হয়েছে। আমাদের কে এই দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

আর স্মরণ কর, যখন তাদের একদল বলল, 'তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছ এমন কওমকে, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন আযাব দেবেন'? তারা বলল, 'তোমাদের রবের নিকট ওযর পেশ করার উদ্দেশ্যে। আশা করা যায় তারা সাবধান হবে। [12]

দাউদ আঃ এর সময়ে,

শনিবার ইহুদিদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিন ছিল। সেই দিনে তাদের মাছ ধরা নিষেধ ছিল। তারা আল্লাহর নিষেধ অবজ্ঞা করে ছলচাতুরি করে মাছ আটকে পরের দিন মাছ ধরত। তখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব আসলো।

তারা মূলত ওখানে তিনটা দল ছিল।

- একদল আল্লাহর বিধানকে মশকরা করে শনিবারে মাছ আটকে রবিবারে ধরতো। তারা ক্রমাগত নাফরমানী করে যাচ্ছিল।
- দ্বিতীয় দল প্রথম দিকে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিল। কিন্তু তারা যখন মানল না তখন হতাশ হয়ে গেল এবং বোঝানো ছেড়ে দিয়েছিল।

---

[11] সূরা আন-নাহল: ১২৫

[12] আল-আ'রাফ ৭:১৬৪

- তৃতীয় দল হচ্ছে তারা যারা হতাশ না হয়ে তাদেরকে অবিরাম উপদেশ দিচ্ছিল। সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করছিল।

যখন দ্বিতীয় দল দেখল তৃতীয় দল ক্রমাগত উপদেশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন দ্বিতীয় দল তৃতীয় দল কে বলল তোমরা কেন তাদেরকে ডাকছো? তারা ক্রমাগত নাফরমানী করেই যাচ্ছে। তাহলে বোঝা যায় আল্লাহ তাদেরকে (১ম দলকে) শাস্তি দিবেন। তাহলে কেন এত কষ্ট করছো?

তৃতীয় দল বললো, আমরা এটা করছি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়মুক্ত হওয়ার জন্য এবং এই উপদেশ দ্বারা হতে পারে তারা তাকওয়া অবলম্বন করল।

তাদের চেষ্টা করার দুইটা কারণ বলেছিল।

- আল্লাহ তায়ালার দরবারে আমরা সকলে হাজির হব। তখন আমরা বলতে পারব, হে আল্লাহ আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলাম। কাজেই তারা যে সকল অন্যায় করে যাচ্ছিল আমরা তার থেকে দায়মুক্ত।
- আমরা এখনো আশাবাদী হয়তো এদের মধ্যে থেকে কোন আল্লাহর বান্দা আমাদের কথা মানবে এবং গুনাহ থেকে ফিরে আসবে।

আল্লাহ তাআলা তাদের এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন যে, সমাজে পাপাচারের ব্যাপক বিস্তার ঘটলে একজন মানুষের দায়িত্ব শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে পড়ে থাকা নয়। অন্যকে সঠিক পথ দেখানো তার কর্তব্য। এটা করা ছাড়া সে পরিপূর্ণ দায়মুক্ত হতে পারবে না।

সত্যের দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে হতাশা হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

এখানে তৃতীয় দল আজাব থেকে বেঁচে যায় কিন্তু দ্বিতীয় দল হয়তো বেঁচে যায় হয়তো আজাবে পতিত হয়।

ইবন কাসির ব্যাখ্যা করেন যে, যারা উপদেশ দিয়েছিল তারা রক্ষা পেয়েছিল, আর যারা নাফরমানী করেছিল তারা বানররূপে রূপান্তরিত হয়েছিল। নীরব দল নিয়ে মতভেদ আছে - কেউ বলেন তারা রক্ষা পেয়েছিল, কেউ বলেন শাস্তি পেয়েছিল।[13]

শিক্ষা:

- নসীহত বা উপদেশ দেওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের দায়িত্ব।
- মানুষ না শুনলেও দাওয়াত ও নসীহত বন্ধ করা যাবে না।
- কখনও কখনও দাওয়াতের উদ্দেশ্য কেবল মানুষকে ফিরিয়ে আনা নয়, বরং আল্লাহর কাছে নিজের দায়িত্ব পালন করা।

রিসালাতের সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই দাওয়াত এর সিলসিলা উম্মতে মুহাম্মাদির উপর ন্যাস্ত এবং অত্যাবশ্যকীয়।

দুনিয়ার মানুষ কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

- উম্মতে ইযাবাত অর্থাৎ সাধারণ উম্মাহ।

- উম্মতে দাওয়াহ অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে সাধারণ মানুষ কে দাওয়াহ দেয়।

[13] তাফসির ইবন কাসির, সূরা আরাফ:১৬৩-১৬৬

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ

অর্থঃ তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। [14]

উম্মতে দাওয়াহ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি।

কুরআন মাজিদে আল্লাহ পাক আমাদের দুটি গ্রুপ থেকে শিক্ষা দিয়েছেন।

১. সম্মানিত

২. লাঞ্ছিত

আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন, পূর্ববর্তী কওমের উপর যে শাস্তি, লাঞ্ছনা, আজাব বা গজব এসেছিল তা মূলত তিনটি কারণে।

১. অন্যায় কাজে বাঁধা না দেওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

অর্থঃ তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল। [15]

এই অন্যায় কাজের মধ্যে সবচেয়ে গর্বিত কাজ শিরক করা। শিরকের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা খুব কঠিন। শিরকের জন্য ইমান ভেঙে যায়।

২. সত্য গোপন করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ أُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ

অর্থঃ নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণের ও। [16]

আমি জানি যে সে অন্যায় করছে কিন্তু তাকে বলছিনা। তবে আমি সত্য গোপন আরছি।

[14] আল ইমরান - আয়াত নং ১১০

[15] আল মায়িদাহ - আয়াত নং ৭৯

[16] আল বাকারা - আয়াত নং ১৫৯

৩. আল্লাহ তা'আলার বিধিবিধান থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِۦٓ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوٓءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

অর্থঃ অতঃপর যখন তারা সেসব বিষয় ভুলে গেল, যা তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল, তখন আমি সেসব লোককে মুক্তি দান করলাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। আর পাকড়াও করলাম, গোনাহগারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের না-ফরমানীর দরুন। [17]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা যদি সৎ কাজে আদেশ না করো এবং অসৎ কাজে বাঁধা না দেও তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর জালিম শাসক দিয়ে দিবেন এবং তখন তোমাদের দো'আও কবুল হবে না।" [18]

অর্থাৎ, যদি মুসলমানগণ সমাজে অন্যায়, পাপ ও জুলুমের বিরুদ্ধে মুখ বন্ধ করে থাকে,তবে আল্লাহ তাদের উপর জালিম নেতাদের কর্তৃত্ব দান করেন -

যারা তাদের উপর নির্যাতন চালায়। ফলস্বরূপ, তখন তাদের দো'আ কবুল হয় না, কারণ তারা নিজেদের দায়িত্ব ত্যাগ করেছে।

এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই শিক্ষার অংশ যেখানে তিনি উম্মতকে ''আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার'' - অর্থাৎ সৎ কাজে আদেশ করা এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অর্থঃ যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার?[19]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা অবশ্যই ভালো কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে। অন্যথায় অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা আযাব থেকে মুক্তির দু'আ করলে কিন্তু তোমাদের দু'আ কবুল হলো না। [20]

এই হাদীসে রাসূল ﷺ উম্মতের জন্য একটি সামাজিক দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন -

আমর বিল মা'রূফ (ভালো কাজের আদেশ)

নাহী আনিল মুনকার (খারাপ কাজ থেকে নিষেধ)

---

[17] আল আরাফ - আয়াত নং ১৬৫

[18] মুসনাদ আহমদ, হাদীস: ১০৪১০; আল-মুজাম আল-কবীর, তাবারানী

[19] হা-মীম সেজদাহ্ - আয়াত নং ৩৩

[20] তিরমিযি, হাদীস: ২১৬৯

যদি মানুষ এই দায়িত্ব ত্যাগ করে, সমাজে অন্যায়, পাপ ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে, তখন আল্লাহর আযাব আসে। তখন মানুষ যতই দু'আ করুক না কেন, তা কবুল হয় না। কারণ তারা নিজেরাই অন্যায় থামানোর দায়িত্ব পালন করেনি।

রিসালাতের সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই দাওয়াত এর দায়িত্ব এখন উম্মতে মোহাম্মদীর। যারা এই দায়িত্ব পালন করে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ এর উপর আমল করে।

দাওয়াতের ফজিলত

১. কুরআনের আলোকে -

- আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর মর্যাদা

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একদল থাকুক যারা মানুষের কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। তারাই সফলকাম।" [21]

- এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন- উম্মতের মধ্যে এমন এক দল থাকতে হবে যারা মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করবে।
- এটি দাওয়াতের ফরজিয়ত ও গুরুত্ব স্পষ্ট করে।

- উত্তম উম্মতের পরিচায়ক দাওয়াত

"তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখো, আর আল্লাহর উপর ঈমান রাখো।" [22]

- এই আয়াত দেখায় যে, উম্মতে মুহাম্মদী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব দাওয়াত ও নাহি আনিল মুনকার (অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার আহ্বান)-এর কারণে।

- দাওয়াত নবীদের কাজ

"নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেক উম্মতে একজন রাসূল পাঠিয়েছি এই বলে যে, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে দূরে থাকো।' [23]

- এখানে বোঝানো হয়েছে যে, দাওয়াত ইলাল্লাহ (আল্লাহর পথে আহ্বান) প্রতিটি নবীর মূল দায়িত্ব ছিল।

- সর্বোত্তম কাজ হলো আল্লাহর পথে আহ্বান করা

"আর সে ব্যক্তির কথা অপেক্ষা উত্তম কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, সৎকাজ করে এবং বলে আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত?" [24]

---

[21] সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৪

[22] সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০

[23] সূরা নাহল, আয়াত ৩৬

[24] সূরা ফুসসিলাত, আয়াত ৩৩

- আল্লাহ তায়ালা দাওয়াতকারীর কথা ও কাজকে পৃথিবীর সর্বোত্তম কাজ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

এখানে দাওয়াতের তিনটি মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে:

i. হিকমাহ (প্রজ্ঞা)
ii. মওইযাহ হাসানাহ (উত্তম উপদেশ)
iii. জিদাল বিল্লাতি হিয়া আহসান (সুন্দরভাবে যুক্তিতর্ক)

২. হাদীসের আলোকে –

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন ব্যক্তি কাউকে হেদায়েতের পথে ডাকলে সে তার সম পরিমাণ সওয়াব পাবে। তবে অনুসারীর সওয়াব থেকে কোন সওয়াব কমবে না। আর যদি কেউ ভ্রান্ত পথে ডাকে তবে সে তা অনুযায়ী সম্মান পাবে তবে তার থেকে মোটেও কমানো হবে না। [25]

- এই হাদীস দাওয়াতের অসীম সওয়াবের কথা ঘোষণা করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রাঃ)-কে বলেছিলেন:
"আল্লাহ তা'আলার শপথ, যদি তোমার দ্বারা আল্লাহ একজন লোক কেউ হেদায়েত দান করেন তবে তা তোমার জন্য একটা লাল উট হতেও উত্তম। [26]

- অর্থাৎ একজন মানুষকেও আল্লাহর পথে আনতে পারা বিশাল সওয়াব ও মর্যাদার কাজ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:
"তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।" [27]

- অর্থাৎ, ইসলামী জ্ঞানের যে পরিমাণই থাকুক না কেন, তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব।

নিরন্তর সওয়াব (সাদকায়ে জারিয়া) - যিনি দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে ভালো কাজে আনেন, তিনি তাদের প্রতিটি আমলের সওয়াবও পান। [28]

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের প্রতিশ্রুতি -
দাওয়াতকারীর কাজ নবীদের কাজ; তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত এর প্রতিদান।

[25] সহিহ মুসলিম, হাদীস: ২৬৭৪

[26] সহিহ বুখারী, হাদীস: ৩৭০১; সহিহ মুসলিম, হাদীস: ২৪০৬

[27] সহিহ বুখারী, হাদীস: ৩৪৬১

[28] সহিহ মুসলিম, হাদীস: ২৬৭৪

দাওয়াত ও নবুয়তের সম্পর্ক

দাওয়াত (دعوة) ও নবুয়াত (نبوّة) অর্থ, তাৎপর্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক

দাওয়াত (دعوة) শব্দটি এসেছে আরবি মূল ধাতু دعوةً – يدعو – دعا থেকে, যার অর্থ হলো ডাকা, আহ্বান করা, নিমন্ত্রণ করা।

ইসলামী পরিভাষায় দাওয়াত বলতে বোঝানো হয় -

''মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা, তাঁর একত্বে (توحيد) বিশ্বাস স্থাপন করানো এবং তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনার দিকে আহ্বান জানানো।''

অর্থাৎ, দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে, অন্যায় থেকে ন্যায়ের পথে, এবং শিরক থেকে তাওহীদের দিকে ফিরিয়ে আনা।

- নবুয়াত (نبوّة) শব্দটি এসেছে نَبَأً (সংবাদ বা বার্তা) ধাতু থেকে।

এর অর্থ হলো - আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সংবাদ বা বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

পরিভাষায়, নবুয়াত হলো -

''আল্লাহ তাআলা যেসব ব্যক্তিকে তাঁর ওহীর মাধ্যমে মানবজাতির কাছে হেদায়াত ও নির্দেশনা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দেন, সেই আল্লাহ নির্বাচিত ব্যক্তিদের নবী বলা হয়, এবং এই দায়িত্বই নবুয়াত।''

অর্থাৎ, নবুয়াত হচ্ছে আল্লাহর বাছাইকৃত মাধ্যম, যার মাধ্যমে মানবজাতি হিদায়াতের বার্তা পায়।

দাওয়াত ও নবুয়াতের পারস্পরিক সম্পর্ক -

দাওয়াত ও নবুয়াত একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। এদের মধ্যে সম্পর্ককে নিচেরভাবে ব্যাখ্যা করা যায় -

নবুয়াত হচ্ছে দাওয়াতের উৎস ও কেন্দ্রবিন্দু। নবীরা আল্লাহর কাছ থেকে ওহী প্রাপ্ত হন এবং সেই বার্তাই মানবজাতির কাছে পৌঁছে দেন, যা দাওয়াতের মূল। নবুয়াত না থাকলে দাওয়াতের উৎসই অস্তিত্ব হারাতো।

- দাওয়াত হচ্ছে নবুয়াতের লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যম।
- নবীদের পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা।
- তাই নবুয়াতের মিশন দাওয়াতের মাধ্যমে বাস্তব রূপ পায়।

নবীরা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাঈ (দাওয়াতদাতা)

তারা নিজেরা আল্লাহর বার্তা প্রচার করেছেন, মানুষকে তাওহীদের পথে আহ্বান করেছেন, এবং অন্যদেরও দাওয়াতের কাজে উৎসাহিত করেছেন। নবুয়াতের উত্তরাধিকার দাওয়াতের দায়িত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। নবুয়াতের যুগ শেষ হলেও দাওয়াতের কাজ বন্ধ হয়নি; বরং নবীদের উম্মতদের উপর দাওয়াতের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে।

যেমন, আল্লাহ বলেন -

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত,যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। তাদের অধিকাংশই ফাসিক। [29]

নবুয়াত হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াতের বার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা, আর দাওয়াত হলো সেই বার্তাকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া।

দাওয়াত ও নবুয়াতের মধ্যে সম্পর্ক হলো অবিচ্ছেদ্য। নবুয়াত হচ্ছে দাওয়াতের উৎস ও কেন্দ্রবিন্দু; আর দাওয়াত হচ্ছে নবুয়াতের লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যম।

কুরআনে নবুয়াত ও দাওয়াতের প্রথম স্বরূপ

কুরআনুল কারীমে প্রথম নবী আদম (আ.) থেকেই নবুয়াত ও দাওয়াতের সূচনা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"হে আদমসন্তান! তোমাদের মধ্য থেকে যখনই তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করে এমন রাসূল আসবে, তখন যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে ও নিজেদের সংশোধন করবে, তাদের কোন ভয় বা দুঃখ থাকবে না।"[30]

এই আয়াতে নবুয়াতের উদ্দেশ্য ও দাওয়াতের সূচনা উভয়ই স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করা হয়েছে আল্লাহর বাণী প্রচারের জন্য - অর্থাৎ দাওয়াতের জন্য।

নবুয়াতের মূল দায়িত্ব ছিল দাওয়াত

আল্লাহ বলেন ,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

"আমি কোনো রাসূলকেই প্রেরণ করিনি, যতক্ষণ না তাকে আল্লাহর অনুমতিতে মান্য করা হয়।" [31]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জানাচ্ছেন যে, প্রতিটি নবী ও রাসূলকে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য হলো , মানুষ যেন তাদের আনুগত্য করে, অর্থাৎ তারা যে দাওয়াত, বিধান ও নির্দেশনা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে আসে, তা যেন মানুষ গ্রহণ করে ও বাস্তবায়ন করে। অতএব, নবী-রাসূলদের আনুগত্য মানে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করা, কারণ তাঁরা নিজেদের পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহর আদেশেই কথা বলেন ও কাজ করেন।

এখান থেকে বোঝা যায়, নবুয়াতের মূল মিশন হলো মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ডাকা , যা দাওয়াতের প্রকৃত রূপ।

আরেক জায়গায় আল্লাহ বলেন -

[29] আলি 'ইমরান ৩:১১০

[30] সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৩৫

[31] সূরা আন-নিসা, ৪:৬৪

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একেকজন রাসূল পাঠিয়েছি (এই বার্তাসহ) আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে দূরে থাকো।" [32]

এই আয়াতটি দাওয়াতের সারকথা প্রকাশ করছে,

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে মানুষ আল্লাহর ইবাদত শেখে এবং তাগুত (মিথ্যা উপাস্য বা শয়তানি প্রভাব) থেকে দূরে থাকে। আল্লাহর দাওয়াত সার্বজনীন এবং নবী-রাসূলরা মানুষকে হেদায়েতের পথে পরিচালিত করার জন্য প্রেরিত।

নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও দাওয়াতের পূর্ণতা

নবুয়াতের ধারাবাহিকতার শেষ প্রেরিত নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর মিশনও ছিল দাওয়াতুল্লাহ, আল্লাহর পথে আহ্বান।

আল্লাহ বলেন,

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

"বলুন, এটাই আমার পথ, আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে, আমি ও যারা আমাকে অনুসরণ করে।" [33]

এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াতের মূলনীতি বোঝানো হয়েছে -

তিনি মানুষকে অন্ধ অনুকরণ নয়, বরং জ্ঞান ও প্রমাণের ভিত্তিতে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন। এবং প্রকৃত দাঈরাও তাঁর অনুসরণে এই নীতিতেই আহ্বান জানায়।

কুরআনের আলোকে দাওয়াত ও নবুয়াতের সম্পর্ক হচ্ছে, দাওয়াতই নবুয়াতের আত্মা ও কেন্দ্রবিন্দু।

নবী-রাসূলগণ দাওয়াতের মাধ্যমে মানবজাতিকে হেদায়াতের পথে আহ্বান করেছেন। নবুয়াতের ধারাবাহিকতা নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এ এসে সমাপ্ত হলেও, দাওয়াতের কাজ কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে তাঁর উম্মতের মাধ্যমে।

[32] সূরা আন-নাহল, ১৬:৩৬

[33] সূরা ইউসুফ, ১২:১০৮

নবীদের দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য

তাওহীদের দিকে আহ্বান

তাওহীদের ভাষাগত ও পরিভাষাগত সংজ্ঞা

"তাওহীদ" (توحيد) শব্দটি এসেছে আরবি ধাতু وَحَّدَ - يُوَحِّدُ - تَوْحِيدًا থেকে, যার অর্থ - এক করা, একত্ব ঘোষণা করা বা একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা। [34]

ইসলামী পরিভাষায়, তাওহীদ বলতে বোঝায় –

"আল্লাহ তাআলাকে একক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করা; সৃষ্টিতে, মালিকানায়, পরিচালনায়, ইবাদতে এবং নাম-গুণে তাঁর কোনো অংশীদার নেই।" [35]

তাওহীদের তিনটি মৌলিক শাখা

ইসলামী আকীদাহবিদদের মতে তাওহীদ তিন ভাগে বিভক্ত , [36]

- তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ (توحيد الربوبية)

অর্থ: আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিশ্বনিয়ন্ত্রক।

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

"আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।" [37]

"এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও পরিচালনাকারী কেবল আল্লাহ একাই।"

- তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ (توحيد الألوهية)

অর্থ: ইবাদত, দো'আ, সিজদা, কুরবানী, নযর সব কেবল আল্লাহর জন্যই হতে হবে।

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

"তোমার রব আদেশ করেছেন তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে।" [38]

"অর্থাৎ 'ইবাদত কেবল আল্লাহর জন্যই হবে, তাঁর কোনো শরীক নেই।'

---

[34] আকীদাহ আত-তাওহীদ, ড. সালিহ আল-ফাওজান, অধ্যায় ১, পৃষ্ঠা ৯

[35] কিতাবুত তাওহীদ ও এর ব্যাখ্যা, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওহাব, অধ্যায় ১, পৃষ্ঠা ৫।

[36] তাফসীর ইবনু কাসীর, ভূমিকা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ১২–১৪, দারুস সালাম, রিয়াদ সংস্করণ

[37] সূরা আয-যুমার ৩৯:৬২

[38] সূরা আল-ইসরা ১৭:২৩

- তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত (توحيد الأسماء والصفات)

অর্থ: আল্লাহর নাম ও গুণাবলিতে তাঁর একত্ব স্বীকার করা, এবং কোনো সৃষ্টির গুণের সঙ্গে তুলনা না করা।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

"তাঁর মতো আর কিছুই নেই।" [39]

"এই আয়াত প্রমাণ করে যে আল্লাহর কোনো সাদৃশ্য নেই; তাঁর গুণাবলি সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।"

নবীগণের দাওয়াতের মূল ভিত্তি ও লক্ষ্য ছিল - মানুষকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করা, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁরই ইবাদত করা। সব নবীই তাঁদের জাতিকে এই মূল বার্তাই দিয়েছেন - "হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য নেই।"

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে বহু জায়গায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য একটিই - শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা।

মানুষ যেন এই ইবাদতের সঠিক অর্থ ও রূপ বুঝতে পারে, সে জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। তাঁদের দাওয়াতের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষকে আল্লাহর একত্বের দিকে আহ্বান করা এবং শিরক তথা আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার করা থেকে বিরত রাখা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوت

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই একজন রাসূল পাঠিয়েছি এই বার্তা নিয়ে যে 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত (মিথ্যা উপাস্য) থেকে দূরে থাকো।' [40]

আল্লাহ তাআলা এখানে নবীদের দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন - এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, কোনো যুগ বা জাতিই রাসূলের দাওয়াত থেকে বঞ্চিত নয়। প্রত্যেক উম্মতের নিকট একজন করে রাসূল পাঠানো হয়েছে, যিনি মানুষকে দুটি বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন -

- "اعْبُدُوا اللَّهَ" - আল্লাহর ইবাদত করো:

অর্থাৎ আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে স্বীকার করো, তাঁর আদেশ মানো, তাঁরই প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করো এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জীবন পরিচালনা করো।

- "وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ" - তাগুত থেকে দূরে থাকো:

"তাগুত" বলতে বোঝায় এমন সব কিছু, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখ হয় -

যেমন: মিথ্যা দেবতা, শয়তান, জাদু, বাতিল মতবাদ, অন্যের ইচ্ছা অনুসরণ ইত্যাদি।

---

[39] সূরা আশ-শূরা ৪২:১১

[40] সূরা আন-নহল, আয়াত ৩৬

অর্থাৎ, নবীদের দাওয়াত ছিল এক আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন (তাওহীদ) এবং সকল মিথ্যা উপাসনা (শিরক) পরিহার করা।

তাফসির ইবন কাসীর-এ বলা হয়েছে -

"আল্লাহ তাআলা প্রতিটি জাতির মধ্যে একজন করে নবী পাঠিয়েছেন, যাতে তারা মানুষকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করে এবং তাগুত ও শিরক থেকে বিরত রাখে।" [41]

অর্থাৎ, প্রতিটি নবী তাঁর জাতিকে এই কথাই বলেছেন -

"لا إله إلا الله" - আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

এটাই নবুয়তের মূল আহ্বান, তাওহীদের কেন্দ্রীয় বার্তা।

নূহ (আঃ), হূদ (আঃ), সালেহ (আঃ), শু'আইব (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) - সকল নবী-রাসূল একই আহ্বানই দিয়েছেন।

[41] তাফসির ইবন কাসীর, সূরা আন-নহল, আয়াত ৩৬

আখিরাতের প্রতি সতর্ক করা

আখিরাতের ভাষাগত ও পরিভাষাগত সংজ্ঞা –

আখিরাত (الآخِرَة) শব্দটি আরবি "আখির" (آخر) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ শেষ বা শেষদিন। শব্দগত অর্থ অনুসারে আখিরাত হলো দুনিয়ার পরবর্তী জীবন বা চূড়ান্ত জীবন।

মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলে।

আখিরাত হলো মৃত্যুর পর শুরু হওয়া চিরস্থায়ী জীবন, যেখানে মানুষের দুনিয়ার কর্মের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি নির্ধারিত হবে।

এখানে দুই প্রকার জীবন বিদ্যমান:

- জান্নাত: যারা আল্লাহর ইবাদত ও সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য চিরস্থায়ী সুখ।
- জাহান্নাম: যারা পাপ করেছে বা আল্লাহর প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়েছে তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি। [42]

আখিরাত হলো দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়ার পর শেষ জীবন বা পরবর্তী জীবন, যা পুনরুত্থান ও চূড়ান্ত বিচারের স্থান। [43]

আখিরাত হলো মৃত্যুর পরের সময়, যেখানে মানুষের সমস্ত কর্মের হিসাব হবে এবং তার ফলাফলের ভিত্তিতে চিরস্থায়ী অবস্থান নির্ধারিত হবে। [44]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى

"এ জীবন মায়াজাল মাত্র, আর পরবর্তী জীবনই চিরস্থায়ী।" [45]

অর্থাৎ, আখিরাতের সুখ বা শাস্তি চিরস্থায়ী, যা দুনিয়ার সাময়িক সুখের থেকে অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত আখিরাতের দিকে মনোযোগ দেওয়া। দুনিয়ার জীবনের প্রলুব্ধতা এড়িয়ে সৎকর্ম ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই প্রধান উদ্দেশ্য।

নবীদের দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য: আখিরাতের প্রতি সতর্কতা।

নবীরা আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হন মানুষের মূল লক্ষ্য পুনর্বিন্যাস করার জন্য। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আনন্দ নয়, বরং চিরস্থায়ী আখিরাতের সুখ অর্জন।

সুতরাং, নবীদের দাওয়াতের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষের মনকে আখিরাতের দিকে ফিরিয়ে আনা।

---

[42] ইবনে কাসীর, তাফসির ইবনে কাসীর, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৫–৪৬

[43] আল-জালালাইন, তাফসির আল-জালালাইন, সূরা আল-ইমরান:১৮৫

[44] তাবারি, তাফসির আল-তাবারি, সূরা আল-বাক্বারাহ:২

[45] সূরা আল-আ'লা ৮৭:১৬-১৭

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقٰى

"বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ। অথচ আখিরাত সর্বোত্তম ও স্থায়ী।"[46]
এই আয়াতে মানুষের দুনিয়ার প্রতি আসক্তি এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী গুরুত্বের মধ্যে তফাৎ বোঝানো হয়েছে।

নবীরা তাদের দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে বোঝাতেন:

- দুনিয়ার সুখ অস্থায়ী, আখিরাত চিরস্থায়ী।
- আখিরাতের শাস্তি বা স্বর্গের পুরস্কার চিরকাল স্থায়ী।
- যা কিছু মানুষ দুনিয়ায় অর্জন করে, তা আখিরাতের তুলনায় নগণ্য।

নবীরা যেভাবে মানুষকে আখিরাতের জন্য সতর্ক করেছেন -
নবীরা বিভিন্ন উপায়ে মানুষের মনকে আখিরাতের দিকে সচেতন করেছেন। এরা মূলত দাওয়াতের মাধ্যমে সতর্কতা প্রদান করেছেন।

1. উপদেশ (নাসিহাহ): নবীরা নিয়মিত মানুষকে ন্যায় ও ধর্মের পথে আহ্বান করতেন।

উদাহরণ: আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ভালো কাজের পুরস্কার এবং খারাপ কাজের শাস্তি।

2. দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আনন্দের বিরুদ্ধে সতর্ক করা: মানুষকে বোঝানো হতো যে, দুনিয়ার জীবন শুধুই পরীক্ষার মঞ্চ। দুনিয়ার তিক্ততা বা আনন্দের কারণে আল্লাহর বিধান ভুলে যাওয়া থেকে বিরত রাখা।

3. আখিরাতের দৃশ্যায়ন (বর্ণনা): স্বর্গ ও জাহান্নামের চিত্র দিয়ে মানুষের মনে সতর্কতা সৃষ্টি।

উদাহরণ: জান্নাতের অসীম আনন্দ ও শান্তি, যা দুনিয়ার সুখের চেয়ে বহুগুণে উত্তম। জাহান্নামের শাস্তি, যা দুনিয়ার কোনো কষ্টের তুলনায় অতিশয় ভয়ঙ্কর।

4. দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা ও উপাখ্যান: নবীরা পূর্ববর্তী জাতির পতনের কাহিনী বর্ণনা করতেন যারা আখিরাতের কথা অবহেলা করেছিল।
   উদাহরণ: নূহ, আদম, লুত প্রভৃতি। এদের মাধ্যমে মানুষের শিক্ষা দেওয়া হতো যে, আল্লাহর বিধান উপেক্ষা করলে চরম শাস্তি হবে।

5. সরাসরি আহ্বান: নবীদের দাওয়াতের মূল বার্তা সবসময়ই "আল্লাহর ইবাদত করো এবং আখিরাতের দিকে লক্ষ্য রাখো।"

উদাহরণ: "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, এই বার্তায় যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত (মিথ্যা উপাস্য) থেকে দূরে থাকো।"

নবীদের দাওয়াতের মূল লক্ষ্য হলো মানুষের মনকে আখিরাতের দিকে ফিরিয়ে আনা। তারা মানুষের কাছে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আনন্দ ও আখিরাতের চিরস্থায়ী পুরস্কার ও শাস্তি তুলে ধরতেন। নবীরা সতর্ক করতেন যে, দুনিয়ার আনন্দে বিভোর হওয়া এবং আখিরাতকে অবহেলা করা মানুষকে চিরস্থায়ী ক্ষতি করবে।

[46] আল-আ'লা ১৬–১৭

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ۝ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ

"মানুষ কি ভাবছে যে আমরা তার হাড়গুলো একত্র করব না? না, অবশ্যই আমরা তার আঙুলের নখ পর্যন্ত সঠিকভাবে পুনঃসৃষ্টি করতে সক্ষম।" [47]

ইমাম তাবারীর জামি' আল-বায়ান অনুযায়ী, এই আয়াত মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভুল ধারণা ভেঙে দেয় যে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্ভব নয়। অনেক মানুষ মনে করে মৃত্যু মানে সব শেষ। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনি প্রতিটি মানুষকে পুনরুত্থিত করতে সক্ষম, এমনকি তাদের আঙুলের নখ পর্যন্ত। এটি আল্লাহর অসীম ক্ষমতার পরিচয় এবং নবীদের দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা মানুষের মনে আখিরাত সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে। [48]

ইমাম কাসিরি ব্যাখ্যা করেছেন, আয়াতটি মানুষকে আখিরাতের শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। নবীরা এই বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেন যাতে তারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আনন্দে মগ্ন না হয়ে আখিরাতের দিকে মনোযোগ দেয়। [49]

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইয়াসিন, উল্লেখ করেছেন যে এই আয়াত মানুষের অবিশ্বাস ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের সন্দেহ দূর করার জন্য নাযিল হয়েছে। নবীদের দাওয়াতের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষকে আল্লাহর একত্ব ও আখিরাতের হিসাব সম্পর্কে সচেতন করা। [50]

আয়াতটি নবীদের দাওয়াতের অংশ, যা মানুষকে সতর্ক করে যে আখিরাত চিরস্থায়ী, এবং আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি জীবের প্রতিটি অংশের হিসাব নিতে সক্ষম।

---

[47] আল-ক্বিয়ামাহ ৭–১০

[48] তাবারী, জামি' আল-বায়ান, খণ্ড ৮, পৃ. ৫৬৭

[49] তাফসির আল-কাসির, খণ্ড ৪, পৃ. ৩১২

[50] মাফরুল কুরআন (খণ্ড ৮, পৃ. ৪৮২–৪৮৩)

শিরক, কুফর ও মিথ্যা প্রথা পরিহারের আহ্বান

শিরক

"شِرْك" শব্দটি এসেছে আরবি মূল ধাতু شَرَكَ – يَشْرَكُ – شِرْكًا থেকে, যার অর্থ অংশীদার করা, সহযোগী বানানো, বা কাউকে কারও সঙ্গে শরিক করা। শাব্দিকভাবে "শিরক" মানে হলো "অংশীদার করা বা শরিক বানানো" ।

ইসলামী পরিভাষায় -

"আল্লাহ তাআলার একত্বে (توحيد) কোনো প্রকারে অংশীদার সাব্যস্ত করাকে 'শিরক' বলা হয়।" অর্থাৎ, আল্লাহর সঙ্গে ইবাদতে, সৃষ্টিতে, গুণে বা বিধান দেওয়ায় কারও অংশীদার স্থির করা। আল্লাহ তাআলার রবুবিয়াত, উলূহিয়াত, নাম ও গুণাবলীতে কাউকে শরিক করা।

ইবন তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন: "শিরক হলো এমন কাজে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা, যা একমাত্র আল্লাহরই বিশেষ গুণ।" [51]

ইবন তাইমিয়্যাহ (রহ.) শিরকের মূল ধারণা স্পষ্ট করেছেন, যে সমস্ত গুণ বা ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত (যেমন সৃষ্টি করা, রিজিক দান করা, ইবাদতের যোগ্য হওয়া), সে গুণে অন্য কাউকে সমান মনে করলেই তা শিরক।[52]

ইমাম গাযালী (রহ.) শিরকের অন্তরগত রূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

অর্থাৎ, বাহ্যিকভাবে কেউ আল্লাহকে মানলেও যদি হৃদয়ে অন্যের উপর ভরসা করে, ভয় পায়, বা আশা রাখে, তবে সেটি "হৃদয়ের শিরক" বা شرك خفيّ (গোপন শিরক)।[53]

উলামাগণ শিরককে তিন ভাগে ভাগ করেছেন -

- শিরক ফি রুবুবিয়্যাহ (شِرْكُ الرُّبُوبِيَّةِ): আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা বা কার্যনির্বাহক মনে করা।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা বা জগত পরিচালনাকারী মনে করাকে শিরক ফি রুবুবিয়্যাহ বলে। উদাহরণ: কেউ মনে করে, "অমুক পীর সন্তান দিতে পারে", বা "অমুক দেবতা বৃষ্টি দেয়"।

- শিরক ফি উলূহিয়্যাহ (شِرْكُ الأُلُوهِيَّةِ): আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদতের যোগ্য মনে করা।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদতের যোগ্য মনে করা বা ইবাদত করা (যেমন দোয়া, সেজদা, মানত, কুরবানি ইত্যাদি করা) একে বলা হয় শিরক ফি উলূহিয়্যাহ। উদাহরণ: কবর, গাছ, পাথর, সূর্য বা মানুষের সামনে সেজদা করা।

- শিরক ফি আসমা ওয়া সিফাত (شِرْكُ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ): আল্লাহর নাম বা গুণে অন্যকে শরিক করা।

আল্লাহর কোনো নাম বা গুণ অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা বা তাঁর গুণের তুলনা অন্য কারো সঙ্গে করা - একে বলা হয় শিরক ফি আসমা ওয়া সিফাত। উদাহরণ: কাউকে "রাযিক" (রিজিকদাতা) বলা, যা কেবল আল্লাহর গুণ।

---

[51] আল-ফাতাওয়া আল-কুবারা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯০

[52] আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৯০

[53] ইহইয়া উলুমুদ্দীন খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৪৫

শিরক পরিহারের আহ্বান

নবুওয়াতের মূল উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে আল্লাহর একত্ব (توحيد) স্বীকারে আহ্বান করা এবং শিরক (شِرْك) বা বহুদেববাদ থেকে বিরত রাখা। কারণ শিরকই মানবজাতির ঈমান, নৈতিকতা এবং মানবতার ভিত্তি ধ্বংস করে দেয়। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবীদের দাওয়াতের মূল বার্তা হিসেবে তাওহীদের দিকে আহ্বান এবং শিরক থেকে বাঁচার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রতিটি নবীর মুখে বার্তা একই -

"يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ"

অর্থ: হে আমার জাতি! আল্লাহর ইবাদত করো; তোমাদের জন্য তাঁর ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।[54]

নবীরা মানুষকে শেখাতেন যে, আল্লাহর গুণাবলীর সাথে কোনো সৃষ্টি বা উপাস্যকে মেলানো বা সমান ধরা একেবারেই তাওহীদের বিপরীত। তাই তাদের মূল শিক্ষা ছিল মানুষের হৃদয়কে আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রাখা। শিরক কেবল বাহ্যিক কাজ নয়, এটি অন্তরের আসক্তি বা অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ ধরা।

নবীদের দাওয়াতের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল আল্লাহ একমাত্র উপাস্য এবং অন্য কোনো শক্তি বা সত্তাকে তার সমকক্ষ না ধরা। শিরক পরিহার করা হলো নবীদের দাওয়াতের একটি মৌলিক শিক্ষা, যা তাদের উম্মতের ধর্মের ভিত্তি তৈরি করে।

প্রত্যেক নবী তাদের উম্মতকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে আহ্বান করেছিলেন এবং শিরক পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। নবীরা শুধুমাত্র বাহ্যিক ইবাদতের প্রতি মনোযোগী ছিলেন না; বরং মানুষের হৃদয় ও বিশ্বাসকে শুদ্ধ রাখার জন্যও শিরক পরিহারের আহ্বান দিতেন।

নবীদের দাওয়াতের মূল বার্তা সংক্ষেপে -"শুধু আল্লাহর প্রতি ইমান আনো এবং যেকোনো শিরক থেকে দূরে থাকো।" এটি নবীদের দাওয়াতের সর্বজনীন নীতি, যা আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। শিরক পরিহার মানে শুধু নির্দিষ্ট পাপ থেকে বিরত থাকা নয়, বরং মানুষের বিশ্বাস ও হৃদয়কে আল্লাহর প্রতি একমাত্র নিবদ্ধ রাখা।

নবীদের দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য হলো তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং শিরক পরিহার, যা মানুষের আধ্যাত্মিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং ঈমানকে দৃঢ় ও সতেজ রাখে।

কুফর

কুফর (كفر) শব্দটির মূল আরবি অর্থ হলো "ঢেকে রাখা" বা "অস্বীকার করা"। শাব্দিক অর্থে কুফর মানে হলো এমন কিছু আড়াল করা যা সত্য, যেমন: আল্লাহর অনুগ্রহ, হিদায়াত বা আল্লাহর নিয়ম। আরবি "কাফারা" ধাতু থেকে উদ্ভূত এই শব্দের সঙ্গে "অগ্রহণ" বা "অস্বীকার" করার ধারণা জড়িত।

পারিভাষিক অর্থে কুফর হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অস্বীকার, তাঁর ইবাদত ও হুকুম মানতে অপ্রত্যয়ী থাকা, এবং তাওহীদ বা নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা। ইসলামিক শরীয়াহতে কুফরকে সাধারণভাবে বোঝায় এমন একটি অবস্থান যেখানে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব, নবী বা আখিরাতের সত্যকে অস্বীকার করে, যা মানুষকে ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

কুফরের উদাহরণ হলো: আল্লাহকে অস্বীকার করা, অন্যকে আল্লাহর সমতুল্য ধরা (শিরক), প্রমিথ্যাবাদী আচরণ, বা নবী ও কুরআনের সত্যকে মানতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করা। কুফর কেবল বাহ্যিক কাজেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি অন্তরের অবস্থার প্রতিফলনও। অর্থাৎ হৃদয়

[54] সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ৫৯

যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখতে অস্বীকার করে, সেটিও কুফরের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে এই শব্দটি বহুবার এসেছে এবং মুসলিমদের সতর্ক করা হয়েছে যেন তারা কুফরের দিকে আকৃষ্ট না হয়।

"وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ"

অর্থ: "আর যারা ঈমান আনার পরও আল্লাহকে অস্বীকার করে, তবে ব্যতীত যারা বাধ্য হয় এবং তার হৃদয় শান্ত থাকে ঈমানের মধ্যে।"[55]

আয়াতটি মূলত কুফরের প্রকৃতি ও ব্যতিক্রম বোঝাচ্ছে। এখানে বলা হয়েছে: যারা ঈমান আনার পরও আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারা কুফরীর মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ, যদি কেউ সত্যিকারের ঈমান গ্রহণ করার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ, তাঁর নবী বা হুকুম অস্বীকার করে, তার অবস্থান কুফরের আওতায়। এটি স্পষ্ট করে দেয় যে কুফর কেবল অজ্ঞতা বা জানার অভাবে ঘটে না, বরং সচেতনভাবে ঈমানের পরও অস্বীকার করা হলে এটি গুরুতর অপরাধ।

কুফর পরিহারের আহ্বান

সব নবীগণ মানুষের কাছে একই বার্তা নিয়ে এসেছিলেন: আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং কুফর পরিহার করা। তারা বলতেন, মানুষের হৃদয় ও মন যেন আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ হয় এবং কখনও আল্লাহকে অস্বীকার বা অন্যকে উপাস্য মনে না করে।

সব নবী মানুষের কাছে কুফরের বিপদ ও ক্ষতির ব্যাপারে সর্বদা সতর্কতা প্রচার করতেন। কুফর কেবল বাহ্যিক আচারে সীমাবদ্ধ নয়, এটি অন্তরের বিশ্বাস ও মনোভাবেরও প্রতিফলন। অর্থাৎ, কেউ বাহ্যিকভাবে ইবাদত করে বা রোজা রাখলেও যদি অন্তরে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস না থাকে বা অন্যকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করে, তা সত্যিকারের ঈমান নয়, বরং কুফরের মধ্যে পড়ে। নবীগণ শিক্ষা দিতেন মানুষকে যে শুধু বাহ্যিক আচারের দ্বারা নয়, অন্তরের ঈমান ও সততার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব।

কুরআনে আল্লাহ বলেন,

"الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ"

অর্থ: "যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তি রয়েছে।"[56]

এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে যে কুফর বা আল্লাহকে অস্বীকার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। যারা আল্লাহর অস্তিত্ব বা হুকুম অস্বীকার করে, তাদের জীবনের ফলাফল কেবল আখিরাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং দুনিয়াতেও তাদের জন্য লাঞ্ছনা, বিপদ ও সামাজিক–নৈতিক দুর্বলতা তৈরি হয়। অর্থাৎ, কুফরের প্রভাব মানসিক, সামাজিক এবং নৈতিক সকল দিকেই প্রতিফলিত হয়। এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে কুফরের পরিণতি কেবল আখিরাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি দুনিয়াতেও বিপদ ও ক্ষতি বয়ে আনে।

নবীগণ উদাহরণ দিয়ে দেখাতেন যে যারা কুফর পরিহার করে এবং আল্লাহর একত্বে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তারা চিরস্থায়ী শান্তি ও আখিরাতের সাফল্য অর্জন করে। তাদের দাওয়াত কেবল ইবাদত মানার আহ্বান নয়, বরং অন্তরের বিশ্বাস, সততা ও অন্তরের আল্লাহভক্তি গঠনের ওপরও গুরুত্বারোপ করে। ফলে, নবীদের আহ্বান সব সময় ছিল—কুফর থেকে বিরত থাকো, আল্লাহর একত্বে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করো, এবং অন্তরসহ আচারে ঈমান পূর্ণ করো, কারণ এটাই মানবজীবনের প্রকৃত সাফল্য ও নিরাপত্তার মূল।

[55] সূরা নাহল, আয়াত ১০৫

[56] সূরা আল-ইমরান, আয়াত ৩৯

মিথ্যা

"মিথ্যা" শব্দটি আরবি كذب থেকে এসেছে, যার শাব্দিক অর্থ হলো সত্যের বিপরীত কথা বলা বা তথ্য প্রদান করা। শব্দটি মূলত এমন কোন বক্তব্য বোঝায় যা সত্য নয়, অসত্য বা ভ্রান্ত।

পরিভাষিক অর্থে, মিথ্যা হলো সত্যের বিপরীত এমন কথা বা কাজ যা মানুষের নৈতিকতা, আধ্যাত্মিক উন্নতি বা সামাজিক কল্যাণের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। মিথ্যা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে - সরাসরি অসত্য বলা, কারও ক্ষতি বা নিজের সুবিধার জন্য ভ্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা, বা ক্ষতি এড়াতে সাময়িকভাবে সত্য লুকানো।

ইমাম গাযালী ইহ্যা উলূমুদ্দীন-এ বলেছেন,"মিথ্যা হলো এমন কাজ বা কথা যা সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন এবং মানুষের নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য ক্ষতিকর।" [57]

ইবন কাইয়্যিম তার গ্রন্থ মাদারিজু সলিকীন-এ উল্লেখ করেছেন,

"মিথ্যা হলো এমন কাজ যা মানুষের আস্থা ও সম্পর্ক নষ্ট করে, এবং যা সত্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখে না।" [58]

আল-কুরতুবী তার তাফসির আল-জামি' লি-আহকাম আল-কুরআন-এ বলেছেন,

"মিথ্যা বলা হলো মানুষের আত্মা ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর, এবং এটি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।" [59]

মিথ্যা পরিহারের আহ্বান

সকল নবীগণ ﷺ মানুষকে সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং মিথ্যা পরিহারের দিকে আহ্বান করেছেন। নবীগণ শুধুমাত্র ধর্মীয় দাওয়াতদাতা ছিলেন না, তারা নৈতিক ও সামাজিক সঠিকতার প্রতীকও ছিলেন।
মানুষকে মিথ্যা, প্রতারণা, হানিকর আচরণ ও অন্যায় থেকে বিরত রাখাই তাদের এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল।

সকল নবীগণ মানুষের নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং মিথ্যা ও প্রতারণা পরিহারের শিক্ষা দিয়ে গেছেন।
ইমাম গাযালী উল্লেখ করেছেন,
নবীগণ সবসময় মানুষের অধিকার রক্ষা এবং সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছেন, এবং মিথ্যা ও প্রতারণা মানুষের আত্মার ক্ষতি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। [60]

ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন,
মিথ্যা ও শিরক মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করলে তা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তাই নবীগণ সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং আল্লাহর একত্বের শিক্ষা প্রচার করেছেন। [61]

ইমাম তাবারী বলেছেন,
নবীগণমানুষকে প্রতারণা, মিথ্যা এবং অন্যকে ক্ষতি করা থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। [62]

---

[57] ইমাম গাযালী, ইহ্যা উলূমুদ্দীন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪৫

[58] ইবন কাইয়্যিম, মাদারিজু সলিকীন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২১৭

[59] আল-কুরতুবী, আল-জামি' লি-আহকাম আল-কুরআন, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৩৪

[60] "ইহ্যা উলুমুদ্দীন" খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৪৫

[61] "আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা" ১/৯০

[62] "তাফসির জামি' আল-বায়ান" খণ্ড ২১, পৃষ্ঠা ২৩৫

ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে দাওয়াত

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁদের মূল দায়িত্ব ছিল মানুষকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করা, শিরক ও অন্যায় থেকে দূরে রাখা, এবং ন্যায় ও নৈতিকতার জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু এই দাওয়াতের পথ কখনোই সহজ ছিল না। মানুষ তাঁদেরকে অস্বীকার করেছে, উপহাস করেছে, এমনকি নির্যাতন ও কষ্ট দিয়েছে। তবুও নবীগণ কখনো হতাশ হননি।

তাঁদের দাওয়াতের মূল ভিত্তি ছিল ধৈর্য (صبر), প্রজ্ঞা (حكمة) এবং উত্তম চরিত্র (أخلاق حسنة)। নবীরা মানুষের বিরোধিতা, উপহাস, নির্যাতন - সবকিছু ধৈর্যসহকারে সহ্য করেছেন এবং কোমল ভাষা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশের মাধ্যমে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন।তাঁদের দাওয়াত ছিল এমন এক আলোকিত আহ্বান যা মানুষের অন্তরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনত। এই দাওয়াতের মূলে ছিল তিনটি মূল গুণ - ধৈর্য (صبر), প্রজ্ঞা (حكمة), এবং উত্তম চরিত্র (أخلاق حسنة)।

ধৈর্য (صبر):

নবীদের দাওয়াতের মূল স্তম্ভ ছিল ধৈর্য। তাঁরা জানতেন, সঠিক পথে আহ্বান করা মানেই প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়া। তবুও তাঁরা নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহর নির্দেশ পালন করেছেন।

নবীদের দাওয়াতের প্রাণশক্তি ছিল ধৈর্য। তাঁরা জানতেন, সত্যের আহ্বান কখনো সহজ নয়। মানুষ যখন অজ্ঞতা, অহংকার ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে, তখন তাদের সেই অন্ধকার থেকে আলোর পথে আহ্বান করা মানেই বিরোধিতা, উপহাস ও নির্যাতনের মুখোমুখি হওয়া। তবুও নবীগণ থেমে যাননি। তাঁরা নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহর আদেশ পালন করেছেন, কারণ তাঁদের হৃদয়ে ছিল দৃঢ় ঈমান ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা।

ধৈর্য ছাড়া দাওয়াত সম্ভব নয়। নবীদের জীবন ধৈর্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

হযরত নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর ধরে তাঁর জাতিকে একত্ববাদের দিকে আহ্বান করেছেন, কিন্তু অল্প কয়েকজনই তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেছে। তবুও তিনি বলেননি, ‘‘আমি ক্লান্ত।’’ বরং আল্লাহর পথে ধৈর্য ধরে অবিচল থেকেছেন।

আল্লাহ বলেন,

قَالَ رَبِّ اِنِّيۡ دَعَوۡتُ قَوۡمِيۡ لَيۡلًا وَّنَهَارًا ۙ
فَلَمۡ يَزِدۡهُمۡ دُعَآءِيۡۤ اِلَّا فِرَارًا

অর্থ: সে বলল, ‘হে আমার রব! আমি তো আমার কওমকে রাত-দিন আহবান করেছি। অতঃপর আমার আহবান কেবল তাদের পলায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে।[63]

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নবী নূহ (আঃ)-এর ধৈর্য, নিষ্ঠা ও অবিচলতার দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে শুধু একবার নয়, বরং দিন-রাত অবিরত আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন। তিনি আল্লাহর একত্বে (توحيد) বিশ্বাস ও শিরক থেকে বিরত থাকার দাওয়াত দিতেন। কিন্তু তাঁর জাতি সেই দাওয়াতকে গ্রহণ না করে আরও দূরে সরে যেত, তাঁকে উপহাস করত, এমনকি তাঁকে কষ্টও দিত। তবুও নূহ (আঃ) দাওয়াতের পথ থেকে সরে যাননি।

ইমাম ইবন কাসির উল্লেখ করেছেন যে,

‘‘নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে ৯৫০ বছর ধরে দাওয়াত দিয়েছেন, তবুও তিনি হতাশ হননি। বরং প্রতিবার প্রতিরোধ ও উপহাসের পর তিনি আরও বেশি তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা) করে আহ্বান অব্যাহত রেখেছেন।’’ [64]

---

[63] নূহ ৭১ :৫-৬

[64] তাফসির ইবন কাসির, সূরা নূহ, আয়াত ৫–৬

ইমাম ইবন কাসির (রহ.) বলেন,
"নূহ (আঃ)-এর দীর্ঘ দাওয়াতের জীবনে ধৈর্য ছিল মূল ভিত্তি। তিনি অবমাননাকেও দাওয়াতের প্রেরণা বানিয়েছিলেন।" [65]

হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর ধৈর্য ছিল নবীদের দাওয়াতি জীবনের এক অসাধারণ নিদর্শন। তিনি এক এমন সমাজে জন্মেছিলেন যেখানে মানুষ সূর্য, চাঁদ, তারা ও পাথরের মূর্তি উপাসনা করত। কিন্তু ইব্রাহিম (আঃ) ছোট বেলা থেকেই এই ভুল বিশ্বাস অস্বীকার করেছিলেন ও অত্যন্ত ধৈর্য ও ভালোবাসার সঙ্গে তাদের সঠিক পথে ডাকার চেষ্টা করেছিলেন।

তিনি তাদের বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন যে যা ডুবে যায় ও অদৃশ্য হয়ে যায় তা কখনোই প্রভু হতে পারে না। সূর্য ডুবে যায়, চাঁদ ঢেকে যায়, তারা মিলিয়ে যায়, অতএব এসব কিছুই ইলাহ (উপাস্য) নয়। তিনি শান্ত ভাষায়, যুক্তি ও দলিল দিয়ে তাদের একত্ববাদের দিকে ডাকতে থাকেন।

কিন্তু তাঁর জাতি তাঁকে উপহাস করল, তাঁর বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করল ও শেষ পর্যন্ত তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিল। তবুও ইব্রাহিম (আঃ) একটুও ভয় বা অস্থিরতা প্রদর্শন করেননি। বরং তিনি পূর্ণ তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা) রাখে বললেন -

حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।" [66]

ইমাম ইবন কাসির (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে যখন ইব্রাহিম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, ফেরেশতারা তাঁকে সাহায্যের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তিনি বললেন, "আমার প্রভু আমার অবস্থা জানেন, তাঁর সাহায্যই আমার জন্য যথেষ্ট।" [67]

এমন অবস্থায়ও তিনি একবিন্দু অভিযোগ করেননি, আল্লাহর রায়ের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই অটল ঈমান ও ধৈর্যের ফলেই আদেশ করলেন ,

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

"হে আগুন! তুমি ইব্রাহিমের জন্য ঠান্ডা ও শান্তি হয়ে যাও।" [68]

এই ঘটনা দেখায় যে, দাওয়াতের পথে যতই বিপদ ও বিরোধ আসুক, আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ ভরসা ও ধৈর্য ধারণ করাই হলো সফলতার চাবিকাঠি।
ইব্রাহিম (আঃ)-এর এই ধৈর্য আমাদের শেখায় - যখন মানুষ বিরোধিতা করে, তখন অভিমান নয়, বরং বিশ্বাস ও অটলতা হলো আল্লাহর দাওয়াতের প্রকৃত চরিত্র।

একইভাবে হযরত মূসা (আঃ)-ও ফেরাউনের মতো এক অহংকারী শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে ধৈর্যসহকারে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন, যদিও ফেরাউন তাঁকে অস্বীকার করেছে, যাদুকরদের সামনে অপমান করেছে। কিন্তু মূসা (আঃ) ক্রোধ নয়, ধৈর্য ও আল্লাহর ভরসায় প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন।
হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে ফেরাউনের কাছে গিয়ে তাঁর জাতিকে আল্লাহর একত্ব ও সত্যের দিকে আহ্বান দিতেন। সেই সময়ে তাঁর জাতি ছিল অত্যন্ত অধর্মপরায়ণ এবং শিরকের মধ্যে আবদ্ধ। ফেরাউন ছিলেন অহংকারী শাসক, যিনি শুধু নিজের ক্ষমতা নয়, ধর্মীয় অবজ্ঞাকেও উৎসাহ দিতেন।

---

[65] তাফসির ইবন কাসির, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৩৭

[66] সহীহ বুখারী, হাদীস: ৪৬৮৪

[67] কাসাসুল আম্বিয়া - ইবন কাসির

[68] সূরা আল-আম্বিয়া: ৬৯

যখন মূসা (আঃ) তাঁর জাতিকে দাওয়াত দিতেন, তখন ফেরাউন তাঁকে মিথ্যাবাদী, জাদুকর এবং উস্কানিমূলক প্রচারক বলে ডাকল। তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করা হচ্ছিল।

এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মূসা (আঃ) যে ধৈর্য দেখিয়েছেন, তা নবীদের দাওয়াতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

আল্লাহ তাআলা মূসা (আঃ)-কে নির্দেশ নিশ্চয়ই,

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

"তোমরা তার সঙ্গে কোমলভাবে কথা বলো, সম্ভবত সে উপদেশ গ্রহণ করবে বা ভয় পাবে।" [69]

এই আয়াতের মাধ্যমে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াতি শিক্ষা পাওয়া যায় -

কোমলতা : নবীকে সরাসরি লড়াই বা বিতর্কে প্রবেশ করতে বলা হয়নি। বরং কোমল ও নম্র ভাষা ব্যবহার করে কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ধৈর্য : শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীর কষ্টদায়ক প্রতিক্রিয়াকে সহ্য করার জন্য ধৈর্য অপরিহার্য।

হযরত মূসা (আঃ)-এর ধৈর্য এবং কোমলতা একসাথে মিলিত হয়ে ফেরাউনের মন পরিবর্তনের চেষ্টা সম্পন্ন করেছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত ফেরাউন স্বীকার করলেন না, মূসা (আঃ)-এর দাওয়াত প্রক্রিয়াটি প্রজ্ঞা ও ধৈর্যের মাধ্যমে কার্যকর হয়েছিল। [70]

হযরত মূসা (আঃ)-এর দাওয়াত আমাদের শেখায় যে ধৈর্য ও কোমলতা দাওয়াতের প্রধান হাতিয়ার। নবীদের দাওয়াত কেবল কথার মাধ্যমে নয়, বরং জীবন ও আচরণের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের শিল্প। মূসা (আঃ)-এর এই প্রজ্ঞাপূর্ণ ও ধৈর্যশীল দাওয়াত আমাদের জন্য দাওয়াতের চূড়ান্ত উদাহরণ।

হযরত ইউসুফ (আঃ) নবী হিসেবে দাওয়াত চালানোর সময় ভাইদের ষড়যন্ত্র ও কারাগারের মতো কঠোর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাকে কূপে ফেলে দেয়া, দাস হিসেবে বিক্রি করা এবং মিথ্যা অভিযোগে কারাগারে রাখা হয়েছিল। তবুও তিনি কখনো হতাশ হননি। বরং ধৈর্য ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে আল্লাহর পথে আহ্বান চালিয়ে গেছেন।

কারাগারে থাকা অবস্থায় ইউসুফ (আঃ) দুই বন্দীকে আল্লাহর একত্ব ও তাওহীদের দাওয়াত দেন। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

قَالَ هَلْ نَجْعَلُ لِلَّهِ شُرَكَاءَ وَهُوَ خَلَقَنِي وَهُوَ يَهْدِينِ

"হে আমার দুই সঙ্গী! অনেক প্রভু ভালো, না একক আল্লাহ উত্তম?" [71]

এই আয়াত আমাদের শেখায় যে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ধৈর্য এবং ধীরস্থিরতা বজায় রেখে সত্যের দাওয়াত দেওয়া সম্ভব।

ইবন কাইয়্যিম (রহ.) উল্লেখ করেন -

"ইউসুফ (আঃ)-এর দাওয়াতের মূল শক্তি ছিল ধৈর্য ও উত্তম চরিত্র। তিনি প্রতিশোধের পরিবর্তে ক্ষমা ও দয়া বেছে নেন।" [72]

---

[69] সূরা ত্বা-হা, আয়াত ৪৪

[70] ইহইয়া উলূমুদ্দীন (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫৭)

[71] সূরা ইউসুফ, আয়াত ৩৯

[72] মাদারিজুস সালিকিন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭৯, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ

প্রজ্ঞা (حِكْمَة):

প্রজ্ঞা (حِكْمَة) হলো এমন বুদ্ধিদীপ্ত উপায়ে সত্যকে উপস্থাপন করা, যা শ্রোতার মনকে আলোড়িত করে। নবীরা কখনো মানুষের অনুভূতিতে আঘাত দেননি; বরং তাঁদের যুক্তি ও উদাহরণের মাধ্যমে সত্যকে সহজে গ্রহণযোগ্য করেছেন।

প্রজ্ঞা (حِكْمَة) নবীদের দাওয়াতি জীবনের অন্যতম ভিত্তি। প্রজ্ঞা মানে শুধু জ্ঞান নয়; বরং এমন বিচক্ষণতা ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা, যার মাধ্যমে মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করা যায় কোমলভাবে, প্রভাবশালীভাবে, এবং এমনভাবে যাতে তার হৃদয়ে সত্য গ্রহণের আগ্রহ জাগে। নবীগণ তাঁদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে শুধু যুক্তি নয়, বরং মানুষের মানসিক অবস্থা, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং হৃদয়ের ভাষা বুঝে তাতে উপযুক্তভাবে সাড়া দিতেন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন তাঁর জাতিকে মূর্তিপূজা থেকে বিরত করতে চাইলেন, তিনি সরাসরি তাঁদের বিশ্বাসকে আঘাত করেননি। বরং যুক্তি দেখিয়ে বললেন-

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيۡهِ الَّيۡلُ رَاٰ كَوۡكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيۡ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَاۤ اُحِبُّ الۡاٰفِلِيۡنَ

অতঃপর যখন রাত তার উপর আচ্ছন্ন হল, সে তারকা দেখল, বলল, 'এ আমার রব' অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন সে বলল, 'যারা ডুবে যায় আমি তাদেরকে ভালবাসি না' [73]

নবী ইবরাহিম (আঃ) বসবাস করতেন এমন এক সমাজে, যেখানে মানুষ সূর্য, চন্দ্র, তারা এবং মূর্তির পূজা করত। তিনি তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে যুক্তি ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন।

তাই তিনি সরাসরি তাদের পূজার বিষয়গুলোকে গালি দেননি; বরং এক প্রজ্ঞাপূর্ণ কৌশলে তাঁদের চিন্তা জাগাতে শুরু করেন।

ইমাম ইবন কাসির (রহঃ) বলেন -

"ইবরাহিম (আঃ) এই কথা বলেছিলেন প্রকৃত বিশ্বাস হিসেবে নয়, বরং তাঁর জাতিকে দেখানোর জন্য যে তাদের বিশ্বাস কতটা অযৌক্তিক। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, যে উপাস্য অস্ত যায়, পরিবর্তিত হয় সে কখনোই রব হতে পারে না।" [74]

অর্থাৎ, ইবরাহিম (আঃ) যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করলেন যে, যে জিনিসের অস্তিত্ব পরিবর্তনশীল, সে কখনোই সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না।

ইমাম তাবারী তাঁর "জামি' আল-বায়ান"-এ বলেন -

"নবী ইবরাহিম (আঃ) তাঁর জাতিকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, যাতে তারা নিজেরাই চিন্তা করে বুঝে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা বোকামি।" [75]

ইবরাহিম (আঃ)-এর এই প্রজ্ঞাপূর্ণ কৌশল দাওয়াতের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি প্রশ্নের মাধ্যমে মানুষের মন খুলে দিতে চেয়েছিলেন যাতে তারা নিজেরাই ভুল বুঝতে পারে।

উত্তম চরিত্র (أخلاق حسنة):

দাওয়াতের প্রকৃত সৌন্দর্য নবীদের চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছিল। নবীগণ শুধু কথা বলতেন না; তাঁদের জীবনে সেই কথার বাস্তব রূপ দেখা যেত। মানুষ তাঁদের চরিত্র দেখে মুগ্ধ হতো, তাঁদের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করত।

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন মানুষকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার জন্য। তাঁদের হাতে ছিল না কোনো রাজদণ্ড, ছিল না সম্পদের জোর - তাঁদের ছিল চরিত্রের আলো এবং আচরণের সৌন্দর্য। নবীগণ শুধু মুখে দাওয়াত দেননি; বরং তাঁদের জীবনই ছিল দাওয়াতের জীবন্ত রূপ। তাঁদের আচরণ, ধৈর্য, ক্ষমা, দয়া ও সততা এমন ছিল যে, মানুষ কথার আগে তাঁদের চরিত্রে ঈমানের সৌন্দর্য দেখতে পেত।

---

[73] সূরা আন'আম, আয়াত ৭৬

[74] তাফসির ইবন কাসির, সূরা আল-আন'আম, আয়াত ৭৬

[75] তাফসির তাবারী, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৭৯

রাসূলুল্লাহ ﷺ - মক্কার কাফেররা তাঁকে কত ব্যাথা দিয়েছিল, উপহাস করেছিল, তবুও তিনি কখনো ক্ষোভ প্রকাশ করেননি। বরং কোমল আচরণ, সততা ও ধৈর্যের মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করেছিলেন। আল্লাহ তাঁকে "মহান চরিত্রের অধিকারী" ঘোষণা করেছেন [76]

হযরত ইউসুফ (আঃ) ভাইদের ষড়যন্ত্র, কারাগার ও কষ্টের মধ্যেও কখনো প্রতিশোধ নেননি। তাঁর ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল চরিত্রই মানুষকে সত্যের দিকে টেনে আনে।

হযরত ইবরাহিম (আঃ) মূর্তিপূজার সমাজে জীবনের প্রতিটি কাজের মাধ্যমে মানুষের মনে যুক্তি ও ঈমানের আলো জাগিয়েছেন।

ইউসুফ (আঃ) কষ্ট ও কারাগারে থেকেও দাওয়াতের কাজ থামাননি। কারাগারে থাকা অবস্থায় দুই বন্দীকে আল্লাহর একত্ব ও তাওহীদের দাওয়াত দেন।

"হে আমার দুই সঙ্গী! অনেক প্রভু ভালো, না একক আল্লাহ উত্তম?" [77]

ইবন কাইয়্যিম (রহ.) বলেন ,

"ইউসুফ (আঃ)-এর দাওয়াতের মূল শক্তি ছিল ধৈর্য ও উত্তম চরিত্র। তিনি প্রতিশোধের পরিবর্তে ক্ষমা ও দয়া বেছে নেন।" [78]

এভাবে, নবীদের চরিত্র, জীবনধারা ও নৈতিকতা ছিল তাদের দাওয়াতের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। মানুষ শুধু তাঁদের কথা শোনার জন্য নয়, বরং তাঁদের আচরণ, জীবনের আদর্শ ও সততার জন্যও আকৃষ্ট হতো। তাঁদের দাওয়াত ছিল এমন, যেখানে হৃদয় জয় করার নরমতা, যুক্তি দিয়ে বোঝানোর প্রজ্ঞা, এবং প্রতিকূলতার মুখে অটল ধৈর্য মিলেমিশে এক অনন্য আদর্শ স্থাপন করেছে। আজও দায়ীদের জন্য এটাই শ্রেষ্ঠ পথনির্দেশ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াত ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের। তিনি কখনও কেবল বক্তৃতা বা যুক্তি প্রদর্শন করেননি; বরং তাঁর আচরণ, চরিত্র ও সৌম্যতা ছিল মানুষের মন জয়ের প্রধান হাতিয়ার। তিনি সবসময় সহানুভূতিশীল, ক্ষমাশীল এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।

মক্কার কুরাইশরা তাঁকে অবহেলা, উপহাস, হুমকি এবং শারীরিক নির্যাতনের মধ্যেও রেখেছিল। তারপরও তিনি কখনও ধৈর্য হারাননি বা প্রতিশোধের চেষ্টা করেননি। বরং কোমলতা, দয়া এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে দাওয়াত চালিয়ে গিয়েছিলেন। এটি প্রমাণ করে যে, দাওয়াতের প্রকৃত শক্তি হলো উত্তম চরিত্র ও ন্যায়পরায়ণ আচরণ।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন,

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"তুমি প্রজ্ঞা এবং সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে তোমার প্রভুর পথে আহ্বান করো এবং তাদের সঙ্গে উত্তম উপায়ে বিতর্ক করো।"[79]

এখানেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রজ্ঞা এবং সৌম্য আচরণ হলো মানুষের মন জয় করার মূল চাবিকাঠি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াতের সময় এই নীতি সর্বদা প্রতিফলিত হয়েছিল।

হিজরতের আগে মক্কার কঠিন পরিস্থিতিতে, যখন পরিবার ও সমাজের চাপ সবশেষ সীমায় পৌঁছেছিল, তখনও তিনি ক্রোধ, বিদ্বেষ বা হতাশা দেখাননি। বরং ধৈর্য, শান্তি এবং কোমল আচরণের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান চালিয়ে গিয়েছিলেন। [80]

[76] সূরা আল-কলম, আয়াত ৪

[77] সূরা ইউসুফ, আয়াত ৩৯

[78] মাদারিজুস সালিকিন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭৯

[79] সূরা নাহল, আয়াত ১২৫

[80] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৭৭

বিভিন্ন নবীর দাওয়াতের রূপ
হযরত আদম আঃ

আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাদের ঘোষণা দিলেন,

"আমি পৃথিবীতে এক খলিফা স্থাপন করতে যাচ্ছি।"

ফেরেশতারা যখন প্রশ্ন করলেন, "আপনি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত করবে?" - তখন আল্লাহ্ তাআলা জবাব দিলেন, "আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।"

এরপর আল্লাহ আদম (আঃ)-কে "সমস্ত নাম" বা জ্ঞান শিখিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট করলেন। ফেরেশতারা সিজদা করলেন, কিন্তু ইবলিস অহংকারে অস্বীকার করল। [81]

আদম ও হাওয়াকে জান্নাতে বসবাসের অনুমতি দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,"এই গাছের কাছে যেয়ো না।" কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় তারা ভুল করলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে "কিছু শব্দ" শিখিয়ে দিলেন, যার মাধ্যমে তাঁরা তওবা করলেন এবং আল্লাহ তাঁদের তওবা কবুল করলেন। [82]

অবশেষে মহান আল্লাহ ঘোষণা করলেন,

"তোমাদের পৃথিবীতে অবতরণ করতে হবে। তবে আমার পক্ষ থেকে যখন হিদায়াত আসবে, যে আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তার জন্য ভয় নেই, দুঃখও নেই।" [83]

আদম (আঃ)-এর নবুওয়াত ও দাওয়াতের সূচনা

মানবজাতির সূচনাতেই নবুওয়াত ও দাওয়াতের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আদম (আঃ) নবী এটি আকীদাহ ও সহীহ রেওয়ায়েতে প্রতিষ্ঠিত। আর প্রথম "রাসূল" হলেন নূহ (আঃ), যা কিয়ামতের দিনের শাফাআতের হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। [84]

আদম (আঃ)-এর দাওয়াতের মূল বার্তা - আদম (আঃ)-এর দায়িত্ব ছিল তাঁর সন্তানদের শেখানো - আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই;ইবাদত ও আনুগত্যে জীবন গঠন করা;ন্যায় ও ইহসান প্রতিষ্ঠা করা;এবং শয়তানকে প্রকাশ্য শত্রু জেনে তার অনুসরণ থেকে সতর্ক থাকা।

কুরআনে বারবার বলা হয়েছে - "হে আদম-সন্তান (يَا بَنِي آدَمَ)"

এই সম্বোধনটি চারবার এসেছে ,প্রতিবারই এই আহ্বান মানুষের নৈতিকতা, লজ্জাবোধ, ইবাদত ও সতর্কতার দিকনির্দেশনা বহন করে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)-এর সন্তানদের উদ্দেশে মানবজীবনের মূল শিক্ষাগুলো পুনঃস্মরণ করিয়েছেন, যে শিক্ষা আদম (আঃ) নিজে প্রথম নবী হিসেবে তাঁর সন্তানদের দিয়েছিলেন।

---

[81] সূরা আল-বাকারা, ২:৩০, সূরা আল-বাকারা ২:৩১–৩৪; আল-আ'রাফ ৭:১১–১৩; সাদ ৩৮:৭১–৭৮

[82] সূরা আল-বাকারা ২:৩৫–৩৭; ত্বা-হা ২০:১১৫–১২২

[83] সূরা আল-বাকারা ২:৩৮–৩৯; ত্বা-হা ২০:১২৩

[84] সহীহ বুখারী ও মুসলিম, শাফাআত অধ্যায়; ইবন কাসীর, ক্বাসাসুল আম্বিয়া, "আদম" অধ্যায়

I. লজ্জা ও পোশাকের আদব

"يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ"

অর্থ: "হে আদম-সন্তানগণ! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আড়াল করে এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আর তাকওয়ার পোশাক সেটিই সর্বোত্তম।"

এখানে বাহ্যিক পোশাকের পাশাপাশি "তাকওয়ার পোশাক"-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা হলো আল্লাহভীতি, লজ্জা ও অন্তরের পবিত্রতা।

ইবন কাসীর বলেন, "তাকওয়ার পোশাক অর্থ হলো সৎকর্ম, নম্রতা ও আল্লাহভীতির দ্বারা আত্মাকে আবৃত রাখা।" [85]

ইমাম কুরতুবীও বলেন,

"لباس التقوى هو العمل الصالح والخشية من الله"

অর্থাৎ "তাকওয়ার পোশাক হলো সৎকর্ম ও আল্লাহভীতি।" [86]

II. শয়তানের প্রতারণা থেকে সতর্কতা

"...يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ"

অর্থ: "হে আদম-সন্তানগণ! যেন শয়তান তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল।"

এখানে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সতর্ক করেছেন যেন তারা আদম ও হাওয়ার মতো শয়তানের ধোঁকায় না পড়ে।

শয়তান সবসময় মানুষকে আল্লাহর আদেশ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে।

ইবন কাসীর বলেন, "শয়তান মানুষের শত্রু, সে আদমকে যেমন বিভ্রান্ত করেছে, তেমনি তার বংশধরকেও সর্বদা বিপথে নিতে চায়।" [87]

ইমাম তাবারী ব্যাখ্যা করেন, "এ আয়াতে আল্লাহ মানুষকে সেই শত্রুর ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, যিনি তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিলেন।" [88]

III. ইবাদতে পরিমিতি ও শ্রদ্ধা

"يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"

অর্থ: "হে আদম-সন্তানগণ! প্রত্যেক নামাজের সময় তোমাদের সাজসজ্জা গ্রহণ করো; খাও ও পান করো, কিন্তু অপচয় করো না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।"

আয়াতটি ইবাদতের সময় শালীন পোশাক ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

---

[85] তাফসির ইবন কাসীর, আল-আ'রাফ ৭:২৬

[86] আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবী, ৭:২৬

[87] তাফসির ইবন কাসীর, আল-আ'রাফ ৭:২৭

[88] তাফসির আত-তাবারী, জামে' আল-বায়ান, ৭:২৭

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, "যখনই কেউ নামাজে দাঁড়ায়, যেন পরিষ্কার ও শোভন পোশাক পরে।" [89]

কুরতুবী বলেন, "মসজিদে সৌন্দর্য গ্রহণ অর্থ, শরীর ও পোশাককে পরিচ্ছন্ন ও শালীন রাখা; এটি ইবাদতের শিষ্টাচার।" [90]

IV. নবীদের প্রতি আনুগত্য ও হিদায়াতের অনুসরণ

"يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"

অর্থ: "হে আদম-সন্তানগণ! যদি তোমাদের কাছে আমার আয়াত বর্ণনা করতে রাসূলগণ আসেন, তবে যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ও নিজেদের সংশোধন করে, তাদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানবজাতির প্রতি নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা ঘোষণা করেছেন। আদম (আঃ)-এর পর প্রত্যেক যুগে নবী প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, মানুষকে তাওহীদের পথে আহ্বান করা ও শয়তানের পথ থেকে রক্ষা করা।

ইবন কাসীর বলেন, "এই আয়াতে আল্লাহ নবুওয়াতের ঘোষণা দিয়েছেন, যাতে মানুষ হিদায়াত অনুসরণ করে মুক্তি লাভ করে।" [91]

যে শিক্ষা আদম (আঃ) নিজে প্রথম নবী হিসেবে তাঁর সন্তানদের দিয়েছিলেন -

"হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন।" [92]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্দেশ দেন ন্যায়বিচার, ইহসান ও আত্মীয়কে দান করার; এবং নিষেধ করেন অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও অবিচার থেকে।" [93]

এই আয়াতগুলো আদম (আঃ)-এর বংশধরদের প্রতি প্রেরিত মূল দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু, যার মাধ্যমে মানবজীবনের নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি স্থাপিত হয়।

হযরত আদম (আঃ)-এর দাওয়াতের সাফলতা হলো -

- তাওহীদের বীজ রোপণ

আদম (আঃ) ছিলেন মানবজাতির প্রথম নবী ও প্রথম মানুষ। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এই তাওহীদের শিক্ষা দেন। এ শিক্ষা মানবসভ্যতার প্রথম ভিত্তি হিসেবে স্থাপিত হয়।

- দাওয়াতের ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠা

আদম (আঃ)-এর দাওয়াতের মাধ্যমেই নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারার সূচনা হয়। তাঁর পরবর্তী প্রত্যেক নবীই এই আহ্বানকে অব্যাহত রাখেন।

- আল্লাহর নিকট তাওবাহ ও ক্ষমা প্রার্থনার শিক্ষা

আদম (আঃ) নিজের ভুল স্বীকার করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন ,"হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি, যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না করো ও রহম না করো তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।" [94]

এই দোয়া ও তাওবাহ মানবজাতিকে শিক্ষা দেয় যে, ভুল হলে তা স্বীকার করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসাই প্রকৃত সফলতা।

---

[89] তাফসির ইবন কাসীর, ৭:৩১

[90] আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, ৭:৩১

[91] তাফসির ইবন কাসীর, আল-আ'রাফ ৭:৩৫

[92] সূরা আল-বাকারা ২:২১–২২

[93] সূরা আন-নাহল ১৬:৯০

[94] সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৩

- নৈতিকতা ও আদবের শিক্ষা প্রতিষ্ঠা

আদম (আঃ)-এর জীবনে পোশাক, লজ্জা ও আনুগত্যের শিক্ষা ছিল দাওয়াতের মৌলিক অংশ। তিনি তাঁর সন্তানদের শয়তানের প্ররোচনা থেকে সতর্ক করতেন।

- আল্লাহর আনুগত্যে জীবনযাপন শেখানো

আদম (আঃ) শেখালেন যে, প্রকৃত মর্যাদা আসে আনুগত্যের মাধ্যমে, অহংকারের মাধ্যমে নয়। যেমন ইবলিস অহংকার করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু আদম (আঃ) বিনয় ও আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমা লাভ করেন।

হযরত শীস আঃ

হযরত শীস (আঃ) ছিলেন হযরত আদম (আঃ)—এর সরাসরি পুত্র। তাঁর নাম "شِيث" (শীস), যার অর্থ -"আল্লাহর দান"এই নামের কারণ হলো, আদম (আঃ)-এর পুত্র হাবিল নিহত হওয়ার পর তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট দো'আ করেছিলেন যেন তাঁকে একটি নেক ও ধার্মিক সন্তান দান করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সেই দো'আ কবুল করে শীস (আঃ)-কে দান করেন।[95]
কাসাসুল আম্বিয়া (ইবন কাসীর), অধ্যায়: "শীস আঃ"
ইবন কাসীর (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, "হযরত শীস (আঃ) নবুওয়াতপ্রাপ্ত ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি আসমান থেকে একটি কিতাব নাজিল করেছিলেন, যাতে হিদায়াত ও শিক্ষা ছিল।" এই কিতাবটি ছিল ছোট একটি "সুহুফ" (পুস্তিকা) যাতে আল্লাহর স্মরণ, ইবাদতের নিয়ম, সৎকাজের আদেশ এবং পারিবারিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারের দিকনির্দেশনা ছিল।[96]

আদম (আঃ)-এর মৃত্যুর পর শীস (আঃ) নবী নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন আল্লাহর একজন নেক বান্দা ও প্রজ্ঞাবান নবী। তাঁর যুগে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, বংশবিস্তার হয় দ্রুত, এবং শীস (আঃ)-এর যুগে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে –

1. একদল ছিল আদম (আঃ) ও শীস (আঃ)-এর অনুসারী, যারা আল্লাহভীরু ও ন্যায়পরায়ণ।
2. অপর দল ছিল কাবিলের বংশধর, যারা অহংকার, অন্যায়,এমনকি গান-বাজনা ও অসচ্চরিত্রতার পথ অবলম্বন করে।

আল্লাহভীরু ও ন্যায়পরায়ণদের দলটি ছিল আদম (আঃ) ও শীস (আঃ)-এর অনুসারী ,তারা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস রাখত, ইবাদতে নিয়মিত ছিল,ন্যায়বিচার করত এবং পাপ থেকে বিরত থাকত।
তাঁদের সমাজে ছিল আদব, নৈতিকতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের শিক্ষা।[97]

কাবিলের বংশধরদের দল -কাবিল এর বংশধরেরা ক্রমে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।তারা আল্লাহর স্মরণ ত্যাগ করে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মগ্ন হয়।গর্ব, হিংসা, অন্যায়, ব্যভিচার এবং গান-বাজনা, এসব তাদের জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়ায়।
ইবন জারীর আত-তাবারী (রহ.) তাঁর তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক—এ উল্লেখ করেন: "কাবিলের বংশধরেরা পাহাড়ের নিচু অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। তারা বাদ্যযন্ত্র তৈরি করে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা শুরু করে, যার ফলে তাদের হৃদয় থেকে লজ্জা ও তাকওয়া দূর হয়ে যায়।" [98]
আরও বলা হয়েছে যে, তারা প্রথম বাদ্যযন্ত্র "মিজমার" (শিসযুক্ত বাঁশি) উদ্ভাবন করে, যার সুরে নারী-পুরুষ একত্রে নাচতে ও গাইতে শুরু করে। এভাবেই পৃথিবীতে প্রথম গুনাহ ও অসচ্চরিত্রতার প্রকাশ ঘটে।[99]

শীস (আঃ)-এর দাওয়াত ও সতর্কবাণী

শীস (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে কাবিলের বংশধরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন, তিনি মানুষকে বলতেন: "তোমরা কাবিলের পথ অনুসরণ করো না। শয়তান তোমাদের কাছে পাপকে সুন্দর করে দেখাবে, কিন্তু জেনে রাখো, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"
এভাবে তিনি দাওয়াত প্রদান করতেন গভীর প্রজ্ঞা, কোমলতা ও ধৈর্যের সঙ্গে। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিতেন আল্লাহভীতি, সৎকাজ, ও অন্যায় থেকে বিরত থাকার উপদেশ।

[95] কাসাসুল আম্বিয়া (ইবন কাসীর), অধ্যায়: "শীস আঃ"
[96] ইবন কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায়: "শীস আঃ"
[97] ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৩
[98] তাবারী, তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৮–১০০
[99] ইবন কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায়: "শীস আঃ"

ইবন কাসীর (রহ.) উল্লেখ করেন, ‘‘শীস (আঃ) ছিলেন আল্লাহর মনোনীত নবী, যিনি মানুষকে ন্যায় ও সত্যের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও পারিবারিক শৃঙ্খলার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন।’’ [100]
শীস (আঃ) শুধু কথা দ্বারা নয়, নিজের কর্মে দাওয়াতের বাস্তব উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন।
তিনি সমাজে ইলম ও আমলের সমন্বয় ঘটান, মানুষকে আল্লাহর নাম স্মরণে উদ্বুদ্ধ করেন, তাদের পারস্পরিক অন্যায়, হত্যা ও লোভ থেকে বিরত থাকতে শিক্ষা দেন, এবং ন্যায়বিচার ও পারিবারিক দায়িত্বের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর নেতৃত্বে আল্লাহভীরু সম্প্রদায় একটি সুশৃঙ্খল ও নৈতিক সমাজ গড়ে তোলে, যেখানে দীন ও দুনিয়া, উভয় দিকের ভারসাম্য রক্ষা করা হতো। [101]

হযরত শীস (আঃ)-এর যুগের ঘটনাগুলি আমাদের শিখায়, সমাজে অন্যায়, অহংকার ও ফিতনা ছড়ালে আল্লাহভীরু মানুষকে সাহসের সঙ্গে সত্যের দাওয়াত দিতে হবে। শয়তান সর্বদা মানুষকে পাপে টেনে নিতে সুন্দর বাহানা সৃষ্টি করে; কিন্তু প্রকৃত মু’মিন সে প্রতারণা বুঝে সতর্ক থাকে। নবীগণের দাওয়াত ছিল জ্ঞান, ন্যায় ও ধৈর্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

শীস (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের সতর্ক করে দাওয়াত দিতেন,
‘‘তোমরা কাবিলের পথ অনুসরণ করো না; শয়তান তোমাদের সাজিয়ে দেখাবে, কিন্তু সে তোমাদের চিরশত্রু।’’
তিনি মানুষকে ধৈর্য ও জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্যে ফেরানোর চেষ্টা করতেন,
সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও সৎকাজে উৎসাহ দিতেন। [102]

শীস (আঃ) জীবনের শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর সন্তানদের উপদেশ দেন যেন তারা আল্লাহভীতি, ন্যায় ও সত্যে অটল থাকে। তাঁর উত্তরাধিকারীরা তাঁর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে নবুওয়াতের ধারাকে বহন করে চলে, এটিই তাঁর দাওয়াতের চূড়ান্ত সফলতা।

---

100 কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায়: ‘‘শীস আঃ’’

101 আল-কুরতুবী, আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, ভূমিকা অংশে নবীদের বর্ণনা। ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ১

102 ইবন জারীর আত-তাবারী, তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৮–১০২

হযরত নূহ আঃ

হযরত নূহ (আঃ) ছিলেন হযরত আদম (আঃ)এর বহু প্রজন্ম পরে আগত এক মহান নবী ও রাসূল। আদম (আঃ) এর পর বহু যুগ পেরিয়ে যখন মানবজাতি পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল, তখন তারা ধীরে ধীরে আল্লাহর নির্দেশ ভুলে গিয়ে ভ্রান্ত পথে পা বাড়ায়। মানুষ নৈতিকতা, সত্য ও তাওহীদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসের পরিবর্তে তারা শয়তানের প্ররোচনায় মূর্তি পূজা ও শিরকের দিকে ঝুঁকে যায়। সমাজে অন্যায়, হত্যা, অহংকার, লালসা ও অবাধ্যতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই অন্ধকার ও পাপাচারে নিমজ্জিত যুগেই আল্লাহ তাআলা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য পাঠালেন হযরত নূহ (আঃ) কে, যিনি মানুষকে আল্লাহর একত্বে ফিরে আসার আহ্বান জানালেন এবং সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করলেন। [103]
আল্লাহ তাআলা বলেন –

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

"আমরা নিশ্চয়ই নূহকে তাঁর জাতির কাছে পাঠিয়েছি, তিনি বললেন 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো।' [104]

হযরত নূহ (আঃ) এর দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল তাওহীদ। অর্থাৎ, মানুষ যেন একমাত্র আল্লাহকেই উপাস্য ও প্রতিপালক হিসেবে স্বীকার করে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক না করে, এবং শিরকের অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়। তাঁর দাওয়াত ছিল শুধু কথার আহ্বান নয়, বরং আচরণ, ধৈর্য ও উদাহরণের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের প্রচেষ্টা।
তিনি তাঁর জাতিকে আল্লাহভীতির পথে ডেকে বলেছিলেন -
"হে আমার জাতি! তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত করো; তোমাদের জন্য তাঁর ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।"
দাওয়াতের প্রধান বিষয়বস্তু -

- তাওহীদ প্রচার: তিনি মানুষকে আহ্বান করেছিলেন এই বলে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। মানুষকে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে ও একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে বলেছিলেন।
- শিরক ও অন্যায় থেকে বিরত রাখা: মানুষকে সতর্ক করেছিলেন যেন তারা মূর্তি পূজা, অবিচার ও অপকর্ম থেকে দূরে থাকে।
- আখিরাতের স্মরণ করানো: তিনি তাঁদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, একদিন আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। এই বিশ্বাস মানুষকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে, অন্যায় থেকে বিরত রাখে।
- ধৈর্য ও স্থিতিশীলতার শিক্ষা: দীর্ঘ ৯৫০ বছর তিনি নিরলসভাবে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে গিয়েছেন, যা মানব ইতিহাসে ধৈর্যের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত। [105]

দাওয়াতের ধরণ –
হযরত নূহ (আঃ) দাওয়াতের কাজ করতেন গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয়ভাবে। তিনি রাতদিন তাঁর জাতিকে সতর্ক করতেন, যেন তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। তাঁর আহ্বানে ছিল নরম উপদেশ, যুক্তি ও উদাহরণের মাধ্যমে হৃদয় স্পর্শ করার প্রচেষ্টা।
আল্লাহ বলেন -

فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

"তিনি বললেন, হে আমার জাতি! আমি তো তোমাদের জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী।"

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

"আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাও, তাঁর জন্য দাওয়াতকে বিশুদ্ধ করো।"

[103] ইবন কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায়: নূহ আঃ
[104] সূরা আল-আ'রাফ: ৫৯
[105] ইবন কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ

106

নূহ (আঃ)-এর জাতির অধিকাংশ মানুষ তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। তাঁরা তাঁকে নিয়ে উপহাস করত, অবমাননা করত, এমনকি ''জাদুকর'' বলেও গালি দিত। শুধু অল্প সংখ্যক মানুষ দরিদ্র ও বিনয়ী শ্রেণি তাঁর প্রতি ঈমান আনে।

আল্লাহ তাআলা বলেন -

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ

''তাঁর সঙ্গে কেবল অল্প সংখ্যক মানুষই ঈমান এনেছিল।'' [107]

হযরত নূহ (আঃ) যখন দেখলেন তাঁর জাতি অবিশ্বাস ও উপহাসে অটল, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে নির্দেশ দিলেন,

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا

''তুমি আমাদের তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে নৌকা প্রস্তুত করো।''

নূহ (আঃ) আল্লাহর আদেশে বিশাল এক নৌকা তৈরি করেন, যাতে প্রতিটি প্রাণীর একজোড়া ও তাঁর ঈমানদার অনুসারীরা আশ্রয় নেন। যখন অবিশ্বাসীরা নৌকা দেখে তাঁকে উপহাস করত, তিনি শান্তভাবে বলতেন –

إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ

''তোমরা যদি আমাদের উপহাস কর, আমরাও একদিন তোমাদের মতোই উপহাস করব।''

অবশেষে, আল্লাহর হুকুমে আকাশ থেকে প্রবল বৃষ্টি নেমে এল এবং পৃথিবীর ফোঁটাগুলোও ফেটে জল উথলে উঠল

فَفَارَ التَّنُّورُ

''তখন চুল্লি থেকে (জল) উথলে উঠল।''

এই প্লাবনে অবিশ্বাসী সবাই ডুবে গেল, আর নূহ (আঃ) ও তাঁর ঈমানদার সাথীরা নিরাপদে নৌকায় রক্ষা পেলেন। [108]

নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতের সফলতা -

হযরত নূহ (আঃ) ছিলেন এক অসাধারণ ধৈর্যশীল ও অবিচল নবী। তিনি প্রায় ৯৫০ বছর ধরে অক্লান্তভাবে তাঁর জাতিকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন। নূহ (আঃ) কখনো ক্লান্ত হননি, কখনো হতাশ হননি। তিনি গোপনে ও প্রকাশ্যে, দিনে ও রাতে মানুষকে আহ্বান করতেন যেন তারা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং শিরক থেকে দূরে থাকে। যদিও অল্প কয়েকজন মানুষ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল, তবুও তাঁর দাওয়াতের প্রকৃত সফলতা ছিল এই যে - তিনি তাওহীদের বার্তাকে টিকিয়ে রেখেছিলেন এবং পরবর্তী নবীগণের দাওয়াতের জন্য ঈমানের এক দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। নূহ (আঃ)-এর জীবনের এই অধ্যায় আমাদের শেখায় যে, দাওয়াতের সফলতা মানুষের সংখ্যায় নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টিতেই নিহিত। [109]

[106] তাফসির ইবন কাসীর, সূরা নূহ:২ ; সূরা গাফির:৬৫

[107] সূরা হুদ: ৪০

[108] তাফসির ইবন কাসীর, তাফসির আল-কুরতুবী (সূরা হূদ ১১:৩৭–৪০); আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ইবন কাসীর

[109] তাফসির ইবন কাসীর; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, কাসাসুল আম্বিয়া

হযরত হূদ আঃ

হযরত হূদ (আঃ) ছিলেন ‘আদ জাতি-এর নবী। এক প্রাচীন ও শক্তিশালী জাতি, যারা ইয়েমেন ও ওমানের মধ্যবর্তী এলাকায় বাস করত। তারা ছিল শারীরিকভাবে বলবান, ধনসম্পদে সমৃদ্ধ এবং স্থাপত্যকলায় পারদর্শী। সুউচ্চ অট্টালিকা, প্রাসাদ ও দুর্গ নির্মাণে তারা গর্ব অনুভব করত এবং নিজেদের শক্তিকে অজেয় মনে করত। কিন্তু ক্রমে তারা আল্লাহকে ভুলে যায় এবং মূর্তি পূজা ও শিরক-এ লিপ্ত হয়। তাদের হৃদয়ে অহংকার, বিলাসিতা ও অবাধ্যতা জন্ম নেয়। শয়তান তাদেরকে প্ররোচিত করেছিল যেন তারা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের শক্তি ও ঐশ্বর্যের উপর নির্ভর করে। এই সময়েই আল্লাহ তাআলা তাদের হিদায়াতের জন্য নবী হযরত হূদ (আঃ)-কে পাঠান যাতে তিনি তাদের আল্লাহর একত্বের পথে ফিরিয়ে আনেন এবং অহংকার ও মূর্তি পূজার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেন। 110

আল্লাহ তাআলা বলেন -

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ

আমি আদ জাতির নিকটে তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম; তিনি বললেন, ‘হে আমার জাতি! আল্লাহর ইবাদত করো, তোমাদের জন্য তাঁর ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।’ [111]

তাঁর দাওয়াতের মূল বিষয় -

হযরত হূদ (আঃ)-এর দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল তাওহীদ। তিনি মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর একত্বের বিশ্বাস স্থাপন করতে চাইতেন, যেন তারা একমাত্র আল্লাহকেই উপাসনা করে। সাথে সাথে তিনি শিরক, অহংকার ও অন্যায় থেকে মানুষকে বিরত রাখার শিক্ষা দিতেন।

তাঁর দাওয়াতের মূল শিক্ষাগুলো ছিল -

- তাওহীদ প্রচার: আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।
- শিরক ও অহংকার ত্যাগ: মানুষ যেন নিজেদের শক্তি বা সম্পদকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে না করে, বরং আল্লাহর ক্ষমতাকেই শ্রেষ্ঠ জানে।
- সৎকাজ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা: সমাজে ন্যায়, সততা ও সত্যের ভিত্তি স্থাপন।
- আল্লাহর শাস্তি ও রহমতের স্মরণ: মানুষ যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর রহমত লাভে চেষ্টা করে।

হূদ (আঃ)-এর দাওয়াত ছিল যুক্তি, প্রজ্ঞা এবং নরম উপদেশের মাধ্যমে, যা তাদের হৃদয় স্পর্শ করে আল্লাহর পথে ফেরানোর চেষ্টা করত। [112]

দাওয়াতের পদ্ধতি:

হযরত হূদ (আঃ) তাঁর জাতিকে দাওয়াত দিতেন অত্যন্ত নরম ভাষা, যুক্তি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে। তিনি তাদের স্মরণ করাতেন যে, আল্লাহর উপাসনা ও আনুগত্য না করলে তাঁদের ধন-সম্পদ, শক্তি ও গৌরব কোনোদিন সত্যিকারের নিরাপত্তা বা সফলতা দিতে পারবে না। তিনি বলতেন, আল্লাহর হুকুম মেনে চলার মধ্যে মানবজাতির কল্যাণ নিহিত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অহংকারে অন্ধ হয়ে নবীর কথাকে অবজ্ঞা করত। তারা তাঁকে উপহাস করত, হাসাহাসি করত এবং বলত, “আমরা কি তোমার কথায় আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ও জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করব?”

---

[110] তাফসির ইবন কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া- ইবন কাসীর

[111] সূরা হূদ: ৫০

[112] তাফসির ইবন কাসীর; কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায়: হূদ (আঃ)

তাদের হৃদয়ে অহংকার, দারিদ্র্য ও ধন-সম্পদের গর্বে অন্ধতা এতটাই প্রবল ছিল যে, তারা নবীর নরম উপদেশ, সতর্কবার্তা ও প্রমাণ সত্ত্বেও দাওয়াত গ্রহণ করতে চায়নি। ফলশ্রুতিতে, তাদের অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস চরম পর্যায়ে পৌঁছায়, যা আল্লাহর শাস্তি প্রাপ্য হওয়ার প্রাকৃতিক ফলাফল। [113]

আল্লাহ তাআলা বলেন -

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

"এত সতর্কবার্তার পরও তারা আমার আজাব থেকে রক্ষা পায়নি।" [114]

আল্লাহর শাস্তি ও পরিণতি -

যখন আদ জাতি হূদ (আঃ)-এর দাওয়াত সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করল, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁদের অবিশ্বাস ও অহংকারের প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রেরণ করলেন। হূদ (আঃ)-এর সতর্কবার্তা, নরম উপদেশ এবং যুক্তিপূর্ণ আহ্বান সত্ত্বেও তারা ফিরে আসেনি। আল্লাহর হুকুমে আদি জাতির ওপর নেমে এল এক অসাধারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। তীব্র ঝড়, ধুলিঝড় এবং প্রচণ্ড বাতাস তাদের শহর ও দুর্গ-বিশিষ্ট বসতভূমি ধ্বংস করে দিল। মানুষের গর্ব, শক্তি ও সম্পদ কিছুই তাদের রক্ষা করতে পারল না। তাদের সমস্ত ধন, বিলাস ও অট্টালিকা এক মুহূর্তেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।

তবে যারা হূদ (আঃ)-এর আহ্বান মেনে ঈমান এনেছিল, তাঁরা এই ধ্বংস থেকে নিরাপদে রক্ষা পেলেন। এ ঘটনা আমাদের শেখায় যে, আল্লাহর আজাব থেকে মুক্তি শুধুমাত্র আনুগত্য, ভয় ও ঈমানের মধ্য দিয়ে সম্ভব। [115]

কুরআনে আল্লাহ তা`আলা বলেছেন -

فَأَخَذَتْهُمُ الرِّيحُ الصَّرْصَرُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ

"তাদের আঘাত করল প্রচণ্ড ঝড়, ফলে তারা নিজেদের ঘরে লাশ হয়ে পড়ে রইল।" [116]

হযরত হূদ (আঃ) এর দাওয়াতের সাফলতা

হযরত হূদ (আঃ) এর দাওয়াতের সাফল্য সংখ্যাগতভাবে নয়, বরং নৈতিক ও ঈমানভিত্তিক সফলতা দ্বারা মাপা যায়। যদিও অধিকাংশ আদ জাতি তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং শিরক, অহংকার ও অবাধ্যতার মধ্যে লিপ্ত ছিল, তবুও হূদ (আঃ)-এর দাওয়াতের প্রকৃত সাফল্য ছিলঃ

- তাওহীদের বার্তা স্থায়ী করা: হূদ (আঃ) তাঁর জাতিকে আল্লাহর একত্ব ও শিরক পরিহারের শিক্ষা দিয়ে স্থায়ী বার্তা স্থাপন করেছিলেন।
- নির্দিষ্ট ঈমানদারদের দল: যাঁরা নবীর আহ্বান মেনে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল, তারা হুমকিপূর্ণ পরিবেশে রক্ষা পেল। এরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সত্যের উদাহরণ এবং নবীদের দাওয়াতের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করেছিল।
- আল্লাহর শাস্তি ও রহমতের শিক্ষা: হূদ (আঃ)-এর যুগের ঘটনা ভবিষ্যতের জাতিকে সতর্ক করে দেয় যে, আল্লাহর আজাব থেকে মুক্তি শুধুমাত্র আনুগত্য, ভয় ও ঈমানের মধ্য দিয়ে সম্ভব।
- নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠা: নবী হূদ (আঃ) মানুষের মধ্যে ন্যায়, সততা ও বিনয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। এই নৈতিক শিক্ষা মানব সমাজের কল্যাণ ও স্থায়িত্বের ভিত্তি স্থাপন করে। [117]

হযরত হূদ (আঃ)-এর দাওয়াত থেকে শিক্ষা

- অহংকার ধ্বংসের কারণ, বিনয় মুক্তির পথ: আদ জাতির অহংকার তাদের ধ্বংসের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিনয় ও আল্লাহভীতি মানুষকে নিরাপদ রাখে।

---

113 তাফসির ইবন কাসীর; কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায়: হূদ (আঃ)

114 সূরা হুদ: ৫৭

115 তাফসির ইবন কাসীর; কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায়: হূদ (আঃ); আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ

116 সূরা হুদ: ৫৮—৬০

117 কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায়: হূদ (আঃ)

- আল্লাহর আনুগত্যই প্রকৃত নিরাপত্তা: শুধুমাত্র আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার মধ্যেই নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিহিত।
- তাওহীদই সকল নবীদের দাওয়াতের ভিত্তি: নবীরা সর্বদা আল্লাহর একত্বের আহ্বান জানিয়েছেন, যা মানবজাতির হিদায়তের মূল।
- আল্লাহর রহমত ও শাস্তি উভয়ই বাস্তব সত্য: ঈমানদাররা আল্লাহর রহমতে রক্ষা পায় ও অবিশ্বাসীরা শাস্তির অধীনে পড়ে। [118]

[118] কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায়: হূদ (আঃ); আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ইবন কাসীর

হযরত সালিহ আঃ

হযরত সালিহ (আঃ) আল্লাহর একজন প্রেরিত নবী ছিলেন, যাকে পাঠানো হয়েছিলেন সামূদ জাতির প্রতি। সামূদ জাতি ছিল প্রাচীন আরবের এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী জনগোষ্ঠী। তাদের সমাজ উন্নত ও সংগঠিত ছিল। তারা পাহাড় খুঁড়ে বিশাল বাসগৃহ, দুর্গ, দুর্গপ্রাসাদ এবং নানান স্থাপত্য নিদর্শন তৈরি করত। তাদের শাসন ব্যবস্থায় নেতৃত্বের ক্ষমতা ও সম্পদের অহংকার লক্ষ্য করা যেত। সামূদ জাতি আল্লাহর নির্দেশনা অগ্রাহ্য করত। তারা ঈমান আনার পরিবর্তে শিরক, মূর্তি পূজা, দানবিক কায়দায় ক্ষমতা ও ধন-সম্পদকে শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন মনে করত। সমাজে অহংকার, প্রতারণা ও শোষণ প্রকটভাবে দেখা যেত। তারা নিজেদের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি নিয়ে অহংকারে নিমগ্ন ছিল এবং দরিদ্র ও দুনিয়ার ন্যায়বিচারহীনদের প্রতি সহানুভূতি দেখাত না।
এই জাতি আল্লাহর প্রেরিত নবী সালিহ (আঃ)-কে স্বাগত না জানিয়ে, বরং অবজ্ঞা ও বিদ্রুপ করত। নবী সালিহ (আঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিতেন, যেটি ছিল সরল, স্পষ্ট এবং যৌক্তিক: একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা ও উপাস্য, শিরক ও অন্যায় পরিহার করতে হবে, ন্যায়পরায়ণতা ও সৎকর্মের মধ্যে জীবন পরিচালনা করতে হবে এবং আল্লাহর আজাব ও রহমতের প্রতি সচেতন হতে হবে।
কিন্তু সামূদ জাতির একটি বড় অংশ নবীর আহ্বানকে অগ্রাহ্য করত। তারা অহংকারে ভরা ও ধন-সম্পদে অতিরিক্ত আস্থাশীল হওয়ায় আল্লাহর নিদর্শন ও সতর্কবার্তা গ্রহণ করত না। ফলে তারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে চলতে থাকে এবং সমাজে শোষণ ও অন্যায় বৃদ্ধি পায়।[119]

হযরত সালিহ (আঃ) তার জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন-

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقْسِطُونَ

"হে আমার জাতি! আল্লাহর ইবাদত করো। তোমাদের জন্য তাঁর বাইরে কোনো উপাস্য নেই। সৎকাজ করো এবং অন্যায় পরিহার করো। আল্লাহর শাস্তি ও রহমতের প্রতি সচেতন হও।" [120]

সালিহ আঃ-র বার্তার মূল বিষয়সমূহ -

- একমাত্র আল্লাহর উপাস্যতা: নবী সালিহ (আঃ) তাদের মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন যে, শুধুমাত্র আল্লাহই ইবাদতের যোগ্য, তাঁর বাইরে কোনো উপাস্য নেই।
- শিরক, মূর্তি পূজা ও অন্যায় পরিহার: তারা যেন মূর্তি পূজা, শিরক বা অন্যায় কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকে।
- সৎকর্ম ও ন্যায়পরায়ণ জীবন: নবী তাদের সৎকাজ, ন্যায়পরায়ণ আচরণ ও নৈতিক জীবনের প্রতি আহ্বান জানান।
- আল্লাহর আজাব ও রহমতের প্রতি সচেতনতা: নবী তাদের সতর্ক করেছিলেন যে আল্লাহর আজাব আসে অবিশ্বাসীদের জন্য এবং তাঁর রহমত লাভ করতে হলে সৎকর্ম ও ঈমানের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। [121]

দাওয়াতের ধরন

হযরত সালিহ (আঃ) অত্যন্ত প্রজ্ঞা, যুক্তি ও সহানুভূতির সাথে তাঁর জাতিকে দাওয়াত দিতেন। তিনি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, ধনসম্পদ ও স্থাপত্য নয়, আল্লাহর আনুগত্যই প্রকৃত নিরাপত্তা। কিন্তু অধিকাংশ সামূদ জাতি অহংকারে অন্ধ হয়ে তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করল। তারা বলল , "তুমি তো আমাদেরই একজন! আমরা কি তোমার কথায় পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করব?" এভাবেই তারা নবীর উপদেশকে উপহাসে পরিণত করল।[122]
আল্লাহ বলেন -

---

[119] কাসাসুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠা ১১২ তাফসীর ইবনে কাসীর

[120] সূরা হুদ: ৬১

[121]তাফসির ইবন কাসীর; কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায়: সালিহ (আঃ)

[122] তাফসির ইবন কাসীর; কাসাসুল আম্বিয়া, ইবন কাসীর

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا... أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ

"তাঁর সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতারা দুর্বল বিশ্বাসীদের বলল: তোমরা কি সত্যিই বিশ্বাস কর যে সালিহ তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত?" [123]

আল্লাহ তাআলা সালিহ (আঃ)-এর মাধ্যমে তাঁদের সামনে একটি অলৌকিক নিদর্শন পাঠালেন, একটি বিশাল উটনী, যা পাহাড় থেকে অলৌকিকভাবে বেরিয়ে এল।

সালিহ (আঃ) বললেন,"এই উটনী আল্লাহর নিদর্শন। এটি যেন আল্লাহর জমিতে স্বাধীনভাবে চরে বেড়ায়, আর তোমরা এর কোনো ক্ষতি করো না।"

এটি ছিল তাঁদের জন্য পরীক্ষা ও সতর্কবার্তা। কিন্তু অবিশ্বাসীরা নবীর নিষেধ অমান্য করে উটনীকে হত্যা করল।

আল্লাহ বলেন -

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ

"তারা উটনীকে হত্যা করল এবং তাদের রবের আদেশ অমান্য করল।" [124]

উটনী হত্যার পর আল্লাহর ক্রোধ তাঁদের উপর নেমে এল।প্রথমে তিন দিন তাদের মুখমণ্ডলে রঙ পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা গেল- একদিন লাল, দ্বিতীয় দিন কালো, তৃতীয় দিন ফ্যাকাসে। তারপর আকাশ থেকে ভয়াবহ শব্দ ও ভূমিকম্পে পুরো জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।

আল্লাহ বলেন -

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ

"তাদেরকে প্রবল চিৎকার আঘাত করল, ফলে তারা নিজেদের ঘরে মৃত অবস্থায় পতিত হলো।" [125]

হযরত সালিহ (আঃ)-এর সতর্কবার্তা অগ্রাহ্য করা অবিশ্বাসীদের জন্য বড় ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা নবীর দাওয়াত উপেক্ষা করল, অহংকার ও লোভে নিমগ্ন থাকল, ফলে আল্লাহর আজাব তাদের ওপর নেমে আসে।

অন্যদিকে, যারা নবীর দাওয়াত মানে এবং ঈমান স্থির রাখে, তারা আল্লাহর আজাব থেকে নিরাপদ থাকে। সালিহ (আঃ)-এর অনুগামীরা নবীর নির্দেশ অনুসরণ করায় রক্ষা পেয়েছিল এবং তারা সতর্কবার্তার প্রতি আনুগত্যের ফলে জীবন ও বিশ্বাস উভয়েই নিরাপদ ছিল। [126]

সালিহ (আঃ)-এর দাওয়াতের সফলতা

- আল্লাহর একত্বে ঈমান স্থাপন করা: যারা সালিহ (আঃ)-এর আহ্বান গ্রহণ করেছিল, তারা আল্লাহর একত্ব স্বীকার করেছিল এবং শিরক, মূর্তি পূজা ও অন্য অপ্রকৃত উপাস্যকে ত্যাগ করেছিল। [127]
- সৎকর্ম ও ন্যায়পরায়ণ জীবন গ্রহণ: সালিহ (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলে অনুগামীরা ন্যায়পরায়ণতা ও সামাজিক সৎকর্মে মনোযোগী হয়েছিল। তারা দুনিয়ার ন্যায়পরায়ণ আচরণ এবং আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জীবনযাপন শুরু করেছিল। [128]
- আল্লাহর নিদর্শন ও পরীক্ষার প্রতি আনুগত্য: সালিহ (আঃ)-এর জাতিকে পাঠানো উটনী নিদর্শন তাদের ঈমান ও আনুগত্য পরীক্ষা করেছিল। যারা উটনীর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলেছিল, তারা নিরাপদ ছিল। [129]

[123] সূরা আল-আরাফ: ৭৫

[124] সূরা আল-আ'রাফ: ৭৭

[125] সূরা আল-ক্বামার: ৩১

[126] কাসাসুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠা 116; তাফসীর ইবনে কাসীর

[127] সূরা হুদ 11:61; কাসাসুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠা 112

[128] তাফসীর ইবনে কাসীর

[129] সূরা আল-ক্বামার 54:29-31

- ধ্বংসপ্রাপ্তদের থেকে আলাদা হয়ে নিরাপদ থাকা: যে ব্যক্তি সালিহ (আঃ)-এর দাওয়াত মেনে চলেছিল, তারা আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল। ফলে নবীর দাওয়াত গ্রহণকারী সম্প্রদায় নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। [130]
- মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর সচেতনতা প্রতিষ্ঠা: নিশ্চিতভাবেই, নবী সালিহ (আঃ)-এর দাওয়াত মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভক্তি স্থাপন করেছিল। এতে তারা জীবনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সচেতন হয়ে উঠেছিল।

[130] কাসাসুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠা ১১৬; তাফসীর ইবনে কাসীর

হযরত ইব্রাহীম আঃ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন প্রাচীন মেসোপটেমিয়া (বাবিল) অঞ্চলের অধিবাসী এক মহৎ নবী ও রাসূল। তাঁর জন্ম এমন এক সমাজে, যেখানে মূর্তিপূজা ছিল প্রচলিত ও স্বাভাবিক। ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল আজার, যিনি নিজেই কাঠ ও পাথরের মূর্তি তৈরি করতেন এবং সেগুলোর পূজায় লিপ্ত থাকতেন।
ছোটবেলা থেকেই ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন অদ্ভুতভাবে চিন্তাশীল ও অনুসন্ধিৎসু। তিনি দেখতেন মানুষ সেই মূর্তিগুলোর সামনে নত হয়, যেগুলো নিজেরাই তৈরি করেছে। এই দৃশ্য তাঁর মনকে ব্যথিত করত। তিনি ভাবতেন, "যে মূর্তি কথা বলতে পারে না, নিজের ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না, সে কীভাবে ইলাহ (উপাস্য) হতে পারে?"
এইভাবেই তাঁর অন্তরে তাওহীদের আলো উদিত হয় আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, কোনো শরীক নেই।
আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ
যখন ইব্রাহীম তাঁর পিতাকে ও তাঁর জাতিকে বললেন - 'এই মূর্তিগুলো কী, যেগুলোর উপাসনায় তোমরা লিপ্ত রয়েছ?' [131]
এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইঙ্গিত করেছেন যে, ইব্রাহীম (আঃ)-এর নবুওয়াতের সূচনা তাঁর নিজ জাতি ও পরিবারের মধ্য থেকেই হয়েছিল। [132]

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দাওয়াতের মূল বার্তা

- হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুরো জীবন জুড়ে মানুষকে আল্লাহর একত্বের প্রতি দাওয়াত দিয়ে গিয়েছেন। তিনি বোঝাতেন, একমাত্র আল্লাহই উপাস্য, তিনি অদ্বিতীয় ও চিরস্থায়ী।
- তিনি তাঁর কওমকে বুঝাতেন যে, মানুষের দ্বারা তৈরি কোনো মূর্তি বা জিনিস কখনোই ইলাহ হতে পারে না। তাই মূর্তি পূজা ও শিরক থেকে বিরত থাকা অতীব জরুরি।
- সঙ্গে তিনি মানবজীবনের নৈতিক ও সামাজিক দিকগুলোতেও দাওয়াত দিতেন ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপন, সৎকর্ম ও মানুষের প্রতি সদাচরণ। মানুষকে শিখাতেন কিভাবে সমাজে মানবতার আদর্শ স্থাপন করতে হয়।
- এছাড়াও ইব্রাহীম (আঃ) বারবার স্মরণ করাতেন আল্লাহর রহমত ও আজাবের কথা। তিনি বলতেন, যারা আল্লাহর পথে ফিরে আসে, তাদের জন্য রহমত; যারা প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য শাস্তি। তাঁর এই দাওয়াতের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষকে সত্য পথে পরিচালিত করা এবং ঈমান ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেওয়া। [133]

দাওয়াতের ধরণ

ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর কওমকে যৌক্তিকভাবে প্রশ্ন করতেন যে, যেসব মূর্তি তারা নিজেরাই তৈরি করেছে সেগুলো কি কখনো আল্লাহ হতে পারে? তারা কি সেই জিনিসের ইবাদত করে, যা মানুষের হাতের তৈরি?

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ
"আপনারা কি সেই জিনিসের ইবাদত করেন যা আপনারা নিজেরাই তৈরি করেন?"
এই আয়াত প্রমাণ করে যে, ইব্রাহীম (আঃ) মানুষের শিরক ও মূর্তিপূজার ভুল যৌক্তিকভাবে বোঝানোর জন্য যুক্তি ব্যবহার করতেন। [134]

---

[131] সূরা আল-আম্বিয়া: ৫২

[132] কাসাসুল আম্বিয়া — ইবনু কাসীর (খণ্ড ১, অধ্যায়: কিসসাতু ইব্রাহীম)

[133] কাসাসুল আম্বিয়া- ইবনু কাসীর; তাফসীর ইবনু কাসীর- সূরা আল-আম্বিয়া: ৫১–৫৭

[134] সূরা আল-আম্বিয়া: ৫৭ ; কাসাসুল আম্বিয়া, ইবনু কাসীর

ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর কওমকে সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্রের উদাহরণ দিয়ে দেখাতেন। তিনি বলতেন এই জ্যোতিষ্ক উদয় হয়, অস্ত যায় এবং পরিবর্তনশীল। তাই, চিরস্থায়ী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ নয় যে তারা হতে পারে।

أَلَمْ تَرَوْا إِلَى اللَّهِ كَيْفَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
"তোমরা কি আল্লাহকে দেখো নি, কিভাবে তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মধ্যে যা আছে?"
এই উদাহরণ দিয়ে ইব্রাহীম (আঃ) বোঝাতেন, একমাত্র আল্লাহই চিরস্থায়ী, সকলের সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণকারী এবং একমাত্র উপাস্য।[135]

ইব্রাহীম (আঃ) এর কওম তাঁর দাওয়াত গ্রহণ না করে বিদ্রোহ ও অবিশ্বাসে অন্ধ হয়ে পড়েছিল। তারা অহংকারে লিপ্ত ছিল এবং আল্লাহর একত্ব অগ্রাহ্য করেছিল। অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নেয়, ইব্রাহীমকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, যাতে তাঁর দাওয়াত এবং প্রভাব বন্ধ হয়ে যায়।[136]

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ
"তারা বললঃ একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।"[137]

তাদের এই পরিকল্পনা ছিল ইব্রাহীমকে ধ্বংস করা এবং আল্লাহর বার্তা বন্ধ করা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবীকে রক্ষা করলেন।

قُلْنَا يَٰنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ
অর্থ: "আমি বললামঃ হে অগ্নি, তুমি ইব্রাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।"[138]

এভাবে আল্লাহ ইব্রাহীম (আঃ)-কে অলৌকিকভাবে রক্ষা করলেন। আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপ তাঁর ওপর প্রভাব ফেলেনি, যা প্রমাণ করে নবীর ধৈর্য, ঈমান এবং আল্লাহর সম্পূর্ণ ক্ষমতা।[139]

দাওয়াতের সফলতা

ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা আজার কিছু অংশে হেদায়াত পাননি, কিন্তু তাঁর সন্তান ইসমাঈল (আঃ) ও ইসহাক (আঃ) আল্লাহর পথে অবিচল থেকেছেন। তারা নবীর দাওয়াত চালিয়ে যান এবং তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করেন।[140]
ইব্রাহীম (আঃ)-এর দাওয়াত আজও মানবজাতির জন্য তাওহীদ ও ন্যায়ের শিক্ষা হিসেবে রয়ে গেছে।
তার কওম তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করলেও, আল্লাহর সাহায্যে তিনি অলৌকিকভাবে রক্ষা পান। এটি তাঁর দাওয়াতের সত্যতা ও আল্লাহর শক্তি প্রমাণ করে।[141]
ইব্রাহীম (আঃ)-এর দাওয়াতের সফলতা মূলত দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা ও সন্তান ও উত্তরসূরীর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও পুরো কওম বিশ্বাসী হয়নি, আল্লাহর অনুগ্রহে দাওয়াতের বার্তা স্থায়ী হয়েছে।[142]

---

[135] তাফসীর ইবনু কাসীর, সূরা আল-আন'আম: ৭৫–৭৯

[136] কাসাসুল আম্বিয়া, ইবনু কাসীর

[137] সূরা আল-আম্বিয়া: ৬৮

[138] সূরা আল-আম্বিয়া: ৬৯

[139] কাসাসুল আম্বিয়া, ইবনু কাসীর, খণ্ড ১

[140] কাসাসুল আম্বিয়া, ইবনু কাসীর

[141] সূরা আল-আম্বিয়া: ৬৮–৬৯

[142] কাসাসুল আম্বিয়া, ইবনু কাসীর, খণ্ড ১

ইব্রাহীম (আঃ)-এর জীবনের প্রধান শিক্ষা

ইব্রাহীম (আঃ)-এর জীবনের প্রধান শিক্ষা হলো তাওহীদ - আল্লাহর একত্বে স্থির বিশ্বাস রাখা। তিনি আমাদের শেখান, আল্লাহ ছাড়া কোনো সৃষ্টিকে উপাস্য মনে করা উচিত নয়। [143]

তিনি দেখিয়েছেন যে মানুষকে বোঝানোর জন্য যুক্তি, প্রমাণ ও বাস্তব উদাহরণ ব্যবহার করা সবচেয়ে কার্যকর। শুধুমাত্র আবেগ বা চাপ দিয়ে দাওয়াত কার্যকর হয় না। [144]

কওমের অবিশ্বাস, বিদ্রোহ ও বিপদ সত্ত্বেও তিনি অপরিবর্তিত ধৈর্য ও ভক্তি প্রদর্শন করেছেন। আমাদের শেখা উচিত কঠিন পরিস্থিতিতেও সত্য পথে অটল থাকা।

ইব্রাহীম (আঃ)-এর জীবন আমাদের শিক্ষা দেয়, নিজের চরিত্র ও কাজের মাধ্যমে দাওয়াত প্রদর্শন করা, যাতে মানুষ আমাদের জীবন থেকে দাওয়াতের প্রভাব অনুভব করে।

তিনি কেবল নিজের জীবনের মাধ্যমে নয়, ইসমাঈল (আঃ) ও ইসহাক (আঃ)-এর মাধ্যমে দাওয়াতের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করেছেন। এটি শিক্ষা দেয়, দাওয়াতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য উত্তরসূরী ও সম্প্রদায়ের ভূমিকা অপরিহার্য। [145]

যখন কওম তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল, আল্লাহ তাঁকে অলৌকিকভাবে রক্ষা করেছিলেন। এটি আমাদের শেখায়, আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থির রাখলে বিপদও পরাজিত করা যায়। [146]

---

[143] কাসাসুল আম্বিয়া, ইবনু কাসীর

[144] তাফসীর ইবনু কাসীর, সূরা আল-আম্বিয়া: ৫৭; সূরা আল-আন‘আম: ৭৫–৭৯

[145] কাসাসুল আম্বিয়া, ইবনু কাসীর

[146] সূরা আল-আম্বিয়া: ৬৮–৬৯

হযরত লূত (আঃ)

হযরত লূত (আঃ) ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আত্মীয় এবং আল্লাহর প্রেরিত নবী। তিনি মানুষের মধ্যে ন্যায়, সততা ও আল্লাহভক্তির বার্তা ছড়াতেন। তাঁর সময়ে সোদোম ও গোমোর্রার মানুষরা নিজেদের লালসা, অহংকার ও অশ্লীল আচরণে নিমগ্ন ছিল। তারা পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে ফেলেছিল এবং নারীদের প্রতি অশ্লীল ও অন্যায় আচরণ করত এবং ব্যভিচার ও সমকামীতায় লিপ্ত ছিল। সমাজে পাপ, ব্যভিচার ও শিরক এতটাই বিস্তৃত ছিল যে, কোনো মানুষ ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপনের কথা ভাবত না।
হযরত লূত (আঃ) তাঁদের সামনে বারবার সতর্কতা প্রদর্শন করতেন, পাপ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকার আহ্বান দিতেন এবং আল্লাহর আদেশ মানার গুরুত্ব বুঝাতেন।

হযরত লূত (আঃ) যখন নবুওয়াতপ্রাপ্ত হলেন, তখন তাঁর সমাজ ছিল গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। মানুষ আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল, মূর্তি ও নিজস্ব কামনার পূজা করত। সমাজে অন্যায়, অশ্লীলতা ও শিরক ছিল সাধারণ ব্যাপার। এই অবস্থায় লূত (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে তাঁর কওমের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমেই তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা, রিজিকদাতা ও উপাস্য।

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ
"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর; তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো উপাস্য নেই।" [147]
তিনি মানুষকে বুঝিয়ে বলতেন -
"তোমরা যাদের পূজা করছ, তারা কিছুই করতে পারে না। তারা না সৃষ্টি করতে পারে, না উপকার বা অপকার দিতে পারে। একমাত্র আল্লাহই তোমাদের স্রষ্টা ও রিজিকদাতা।"
লূত (আঃ)-এর তাওহীদের দাওয়াত ছিল এক আলোকবর্তিকা, যা শিরক ও জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজে আল্লাহভীতির আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল। [148]

ইবন কাসীর তাঁর "তাফসীরুল কুরআনিল আযীম"-এ উল্লেখ করেন যে, লূত (আঃ)-এর কওম শুধুমাত্র যৌন বিকৃতির অপরাধেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অন্যায়েও লিপ্ত ছিল - যেমন ওজনে ও মাপে কম দেওয়া, ব্যবসায় প্রতারণা, এবং অতিথিদের অপমান করা। [149]

ইমাম তাবারী তাঁর "তাফসীর আত-তাবারী" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, লূতের কওম আল্লাহর অবাধ্যতায় সীমা লঙ্ঘন করেছিল। তারা মূর্তি পূজা করত, যৌন বিকৃতিতে লিপ্ত ছিল এবং বাণিজ্যিক লেনদেনে অন্যায়ের আশ্রয় নিত।
তিনি বলেন
"كانوا يعملون بالخبيث، ويخونون في الكيل والميزان، ويقطعون السبيل، ويأتون الذكران من دون النساء."
অর্থাৎ -
"তারা অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল, মাপে ও ওজনে প্রতারণা করত, পথ রোধ করে ডাকাতি করত, এবং নারীদের পরিবর্তে পুরুষদের সঙ্গে যৌনাচার করত।" [150]

এইসব গুনাহ একত্রে তাদের ওপর আল্লাহর ক্রোধ নাযিলের কারণ হয়েছিল।

[147] সূরা আল-আ'রাফ: ৭:৮০
[148] ইবন কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায়: "লূত (আঃ)"; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ১
[149] তাফসীর ইবন কাসীর: সূরা আল-আ'রাফ ৭:৮০ ও আশ-শু'আরাআ ২৬:১৬১-এর ব্যাখ্যা অংশ
[150] তাফসীর আত-তাবারী, ব্যাখ্যা: সূরা আল-আ'রাফ ৭:৮০–৮১

যখন লূত (আঃ)-এর কওম তাঁর দাওয়াত উপহাস করল, তওবা করল না, বরং গুনাহে লিপ্ত থাকল, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর ফেরেশতাদের পাঠালেন। তাঁরা প্রথমে ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকটে এসে তাঁকে সুসংবাদ দেন, তারপর লূতের শহরের দিকে রওনা হন।

তিনজন ফেরেশতা (জিবরীল, মীকাঈল ও ইসরাফীল) সুন্দর যুবকের রূপে লূতের বাড়িতে আসেন। তাঁর স্ত্রী (যিনি অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) শহরের লোকদের খবর দেয়, আর লূতের কওম সেই অতিথিদের দিকে ছুটে আসে অশ্লীল উদ্দেশ্যে। লূত (আঃ) তাঁদের লজ্জা ও ধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়ে সতর্ক করেন, কিন্তু তারা শোনেনি। তখন ফেরেশতারা নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করেন এবং বলেন -

يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ
إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

"হে লূত! আমরা তোমার প্রভুর দূত, তারা তোমার কাছে পৌঁছাতে পারবে না।"
"তাদের ধ্বংসের সময় সকাল, সকাল কি খুব দূরে?" [151]

লূত (আঃ)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেন তিনি রাতের শেষ প্রহরে তাঁর পরিবার নিয়ে শহর ত্যাগ করেন, তবে স্ত্রী পেছনে ফিরে না তাকানোর নির্দেশ পাননি, আর তাকিয়ে তিনি ধ্বংস হন। ফেরেশতা জিবরীল (আঃ) সেই নগরীগুলোকে ডান পাখার আগা দিয়ে আকাশে তুলে নেন, সেখানে তাদের পশুর ডাক পর্যন্ত ফেরেশতারা শুনতে পেতেন, তারপর নিচে ফেলে দেন, আর তার ওপর সিজ্জীলের (পোড়া পাথর) বৃষ্টি ঝরানো হয়। [152]

হযরত লূত (আঃ) এর দাওয়াতের সফলতা ছিল সীমিত সংখ্যক মানুষের ঈমান আনা ও তাঁর পরিবার থেকে কিছুজনের মুক্তি লাভে। যদিও তাঁর অধিকাংশ কওম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তবুও তাঁর দাওয়াত মানবজাতির জন্য অমূল্য শিক্ষা রেখে যায়।

লূত (আঃ) তাঁর কওমকে বারবার সতর্ক করেছিলেন, তাওহীদ, নৈতিকতা ও পবিত্রতার পথে ফিরে আসার আহ্বান দিয়েছিলেন। তাঁর এই দাওয়াত নবুওয়তের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করার সাফল্য অর্জন করে।

তাঁর দাওয়াতের প্রভাবে কেবল তাঁর কন্যারা ও অল্পসংখ্যক বিশ্বাসী মানুষ ঈমান এনেছিল। তাঁরা আল্লাহর আদেশে রক্ষা পান, আর শিরক ও অশ্লীলতায় লিপ্তরা ধ্বংস হয়।

লূত (আঃ)-এর দাওয়াত ব্যর্থ নয়, বরং তাঁর কওমের ধ্বংসের মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম অমান্যের ফলাফল যুগে যুগে শিক্ষা হয়ে আছে।

লূত (আঃ)-এর দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষকে শিক্ষা দেন যে,সমাজের স্থিতি, পরিবারব্যবস্থা ও মানবজীবনের নৈতিকতা শরিয়তের সীমারেখা মানার মধ্যেই টিকে থাকে।

---

[151] সূরা হুদ ১১:৮১

[152] ইবন কাসীর -আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ১

হযরত ইসমাঈল (আঃ)

হযরত ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বড় সন্তান এবং মাতৃপরিচয় হাজরা (আঃ) জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি বিশেষ করুণার দৃষ্টি রাখলেন। কুরআনে আল্লাহ তাআলা স্মরণ করিয়েছেন:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَرَسُولًا نَبِيًّا

"স্মরণ করো ইসমাঈলকে, তিনি সত্যবাদী ও নবী ছিলেন।" [153]

তাঁর জীবন সৎকাজ, তাওহীদ প্রচার ও নবুওয়াতের অনুশীলনের এক অনন্য উদাহরণ। তিনি মানুষের মধ্যে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, সততা এবং আল্লাহর আদেশ মানার শিক্ষা ছড়িয়েছেন।

দাওয়াতের মূল বার্তা –

- তাওহীদ প্রচার - ইসমাঈল (আঃ) মানুষের মনে স্থাপন করতেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। মূর্তি পূজা বা শিরক থেকে দূরে থাকতে হবে।
- সৎকাজ ও ন্যায়পরায়ণ জীবন - তিনি পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখার শিক্ষা দিতেন।
- শিরক ও মূর্তি পূজা পরিহার - মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত বিশ্বাস, অন্ধশ্রদ্ধা ও মূর্তি পূজার প্রবণতা দূর করার জন্য সতর্ক করতেন।
- আল্লাহর আজাব ও রহমতের প্রতি সচেতনতা - যারা শিরক, অন্যায় বা অসৎ কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাদেরকে সতর্ক করতেন; যারা সৎকাজে নিয়োজিত, তাদেরকে উৎসাহিত করতেন। [154]

হযরত ইসমাঈল (আঃ) সরাসরি নবী হিসেবে মানুষের মধ্যে ন্যায় ও সৎকাজ প্রতিষ্ঠা করতেন। তিনি কেবল আল্লাহর দাওয়াত প্রচার করতেন না, বরং মানবজাতিকে আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য নির্দেশনা দিতেন। যারা তাঁর আহ্বান মেনে আল্লাহর পথে চলত, তাদেরকে প্রশংসা ও উৎসাহ দিতেন। যারা অবাধ্য হত, তাদেরকে সতর্ক করতেন এবং আল্লাহর করুণা ও দয়া স্মরণ করিয়ে দিতেন, যাতে তারা পুনরায় সৎকাজে ফিরে আসে। [155]

হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলে মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতি, নৈতিক সচেতনতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। যে কেউ তাঁর দাওয়াত মেনে আল্লাহর পথে চলত, আল্লাহর সাহায্যে সে সৎকাজে নিয়োজিত হতো, মানুষ ও সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত হতো। এটি প্রমাণ করে যে, নবীর দাওয়াতের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় শুধুমাত্র ঈমানদারদের মধ্যে, আর যারা অবাধ্য থাকে, তাদেরকে সতর্কবার্তা দেওয়া হয় এবং আল্লাহর শাস্তির সম্ভাবনা স্মরণ করানো হয়। [156]

হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর দাওয়াতের সফলতা

- আল্লাহভীতি প্রতিষ্ঠা - ইসমাঈল (আঃ)-এর আহ্বানে যারা সাড়া দিয়েছিল, তাদের মধ্যে আল্লাহভীতি ও ঈমানের গভীরতা জন্ম নিয়েছিল।
- ন্যায় ও সততার প্রচার - দাওয়াত গ্রহণকারী মানুষ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও সৎকর্ম পালন করতে শুরু করেছিল।

---

[153] সূরা মেরিয়ম ৫৪–৫৫

[154] ইবন কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায়: "ইসমাঈল (আঃ)"; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ১

[155] ইবন কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায়: "ইসমাঈল (আঃ)"

[156] ইবন কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায়: "ইসমাঈল (আঃ)"; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ১

- সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা - দরিদ্র ও সাহায্যপ্রার্থী মানুষের প্রতি দয়া, ব্যবসায় সততা ও সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হতো।

- মানবজাতির জন্য স্থায়ী নিদর্শন - ইসমাঈল (আঃ) ও হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কাবা নির্মাণ করেছিলেন। কাবা আজও মানবজাতির জন্য ঈমান, তাওহীদ ও আল্লাহভক্তির স্থায়ী চিহ্ন হিসেবে বিদ্যমান।

- নবীর দাওয়াতের ফলপ্রসূতা - যেখানে মানুষ ইসমাঈল (আঃ)-এর আহ্বান মেনে আল্লাহর পথে চলেছিল, সেখানে আল্লাহর রহমত ও সাহায্য লক্ষ্য করা যেত। অবাধ্যদের প্রতি সতর্কবার্তা দেওয়া হলেও, ঈমানদাররা তাঁর দাওয়াত থেকে সর্বোচ্চ প্রভাব অর্জন করেছিল। [157]

[157] ইবন কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায়: ‘‘ইসমাঈল (আঃ)’’

হযরত মূসা (আঃ)

হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন বনি ইস্রাঈল জাতির নবী। তার জন্মের সময়, মিসরের কুখ্যাত ফেরাউন বনি ইস্রাঈল শিশুদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত মূসা আঃ-এর মা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে তাঁকে লুকিয়ে নীল নদে ভাসিয়ে দিলেন। নদীতে ভেসে যাওয়ার সময় মূসা আঃ নিরাপদে নদীর ধারে পৌঁছান। নদীর ধারে ফেরাউন ও তার স্ত্রী মূসা আঃ-কে দেখলেন। তারা শিশুটিকে গ্রহণ করলেন এবং প্রাসাদে বড় করতে শুরু করলেন।
ফেরাউনের প্রাসাদে বড় হওয়ার সময়, মূসা (আঃ) আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও ঈমানের শিক্ষা পেলেন। মানব জাতির প্রতি দয়া ও ন্যায়পরায়ণতার চেতনা অর্জন করলেন। শক্তিশালী শাসক ফেরাউন ও তার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আল্লাহর দাওয়াত দেওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। [158]

আল্লাহ তাআলার সাহায্যে শিশু মূসা নিরাপদে বড় হতে পারলেন। বড় হয়ে, হযরত মূসা আঃ আল্লাহর অনুগ্রহে দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক ফেরাউনের সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাওয়াত দিতে সক্ষম হন। তিনি সরাসরি ফেরাউন ও অবিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করতেন এবং বনি ইস্রাঈলকে ন্যায়পরায়ণ ও আল্লাহভক্ত জীবনযাপনের শিক্ষা দিতেন। [159]

হযরত মূসা আঃ-এর দাওয়াতের মূল বার্তা ছিল -

- তাওহীদ প্রচার - মানুষকে স্মরণ করানো যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।
- ফেরাউন ও অবিশ্বাসীদের শিরক ও অন্যায় পরিহার - তাদেরকে সতর্ক করা।
- বনি ইস্রাঈলকে ন্যায়পরায়ণ ও আল্লাহভক্ত জীবনযাপন শেখানো।
- আল্লাহর শাস্তি ও রহমতের প্রতি সচেতন করা - যারা অবাধ্য তাদের সতর্ক করা, যারা সৎকাজে লিপ্ত তাদের উৎসাহ দেওয়া। [160]

হযরত মূসা আঃ সরাসরি ফেরাউন ও তার প্রাসাদবাসীদের কাছে গিয়ে আল্লাহর পথে আহ্বান দিতেন। তিনি তাদেরকে সতর্ক করতেন যে, শিরক, অন্যায় ও অবাধ্যতার পথ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। ফেরাউন এবং তার জাদুকররা তখনো অহংকারী এবং অবিশ্বাসী হওয়ায় মূসা আঃকে অবমাননা ও উপহাস করত।

আল্লাহ তা`আলা বলেন,

اذْهَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَى

তোমরা উভয়ে ফেরআউনের কাছে যাও সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। [161]

আল্লাহর অনুগ্রহে মূসা আঃ অলৌকিক নিদর্শন দেখাতেন, যা মানুষকে ঈমান আনতে প্ররোচিত করত।

- লাঠি সাপ হওয়া: মূসা আঃ-এর লাঠি হঠাৎ সাপের রূপ নেয়, যা ফেরাউন ও তার জাদুকরদের সামনে আল্লাহর শক্তি প্রদর্শন করে। হযরত মূসা আঃ ফেরাউনের দরবারে গিয়ে ঈমানের আহ্বান দিলেন। ফেরাউন ও তার জাদুকররা তাদের অহংকারে বিশ্বাসী ছিল। আল্লাহর নির্দেশে মূসা আঃ-এর লাঠি হঠাৎ সাপের রূপ নিল। ফেরাউন ও জাদুকররা বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। এটি ছিল আল্লাহর সরাসরি শক্তি ও নিদর্শন, যা মানুষকে ঈমানের দিকে আহ্বান করার জন্য প্রদর্শিত হয়েছিল।

---

[158] ইবন কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায়: "মূসা (আঃ)"; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ১

[159] ইবন কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায়: "মূসা (আঃ)"

[160] ইবন কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায়: "মূসা (আঃ)"; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ১

[161] ত্বোহা আয়াত: ৪৩

- হাত আলোকিত হওয়া: মূসা আঃ-এর হাত আলোকিত হয়ে সবের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। হযরত মূসা আঃ-এর হাত আলোকিত হয়ে উঠল, যা ফেরাউন ও উপস্থিত লোকদের নজর কাড়ল। এটি আল্লাহর মহিমান্বিত শক্তি প্রদর্শনের একটি নিদর্শন। ফেরাউন ও তার লোকেরা তখনও অহংকারে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারালেও, এটি ছিল বনি ইস্রাঈলকে প্রেরণা দেওয়ার একটি চিহ্ন।

- দুর্যোগ ও নিদর্শন: আল্লাহর নির্দেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক নিদর্শন যেমন প্লেগ বা দুর্যোগ ঘটিয়ে অবিশ্বাসীদের সতর্ক করা হতো। হযরত মূসা আঃ বনি ইস্রাঈলকে মিসরের শাসকের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য লাল সাগরের তীরের দিকে এগোলেন। আল্লাহর আজানের নির্দেশে মূসা আঃ লাঠি দিয়ে সমুদ্রের পানি ছুঁড়লেন, যা উভয় তীরে ভাগ হয়ে এক বিশাল পথ সৃষ্টি করল।বনি ইস্রাঈল নিরাপদে নদী পার হলেন, যা আল্লাহর মহিমা ও করুণার নিদর্শন হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত। [162]

যখন ফেরাউন ও তার বাহিনী বনি ইস্রাঈলকে ধরার জন্য সমুদ্রের তীরে পৌঁছাল, তখন পানি আবার মিলিত হয়ে ফেরাউনের ওপর ঢলে এল। ফেরাউন এবং তার বাহিনী ডুবে মারা গেল, যা ছিল অবাধ্য ও অন্যায়ের পথে চলা জাতির চূড়ান্ত শাস্তি। বনি ইস্রাঈল এইভাবে মুক্তি পেলেন, যা আল্লাহর শক্তি ও ন্যায়পরায়ণতার নিদর্শন। [163]

নবীর দাওয়াতের চূড়ান্ত সাফল্য

বনি ইস্রাঈল মুক্তি পেলেন এবং আল্লাহভীতি ও ন্যায়পরায়ণ জীবন স্থাপন করলেন। অবাধ্য ও অন্যায়ের পথে থাকা ফেরাউন ও তার বাহিনী ধ্বংস হল।
এটি প্রমাণ করে, নবীর দাওয়াতের সফলতা আল্লাহর সাহায্য ও নিদর্শনের মাধ্যমে সৎকর্মে নিয়োজিতদের মধ্যে ফলপ্রসূ হয়, আর অবাধ্যদের সতর্ককরণ ও শাস্তি দেয়। [164]

[162] ইবন কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায়: "মূসা (আঃ)"; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ১; তাফসীর আত-তাবারী

[163] ইবন কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া; তাফসীর আত-তাবারী, খণ্ড ১

[164] আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ১; তাফসীর আত-তাবারী, খণ্ড ১

হযরত হারুন (আঃ)

হযরত হারুন (আঃ) ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)-এর বড় ভাই। তিনি বনি ইস্রাঈল জাতির মধ্যে নবুওয়াত প্রাপ্ত ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে মূসা (আঃ)-কে সহায়ক হিসেবে পাঠিয়েছেন, যাতে দাওয়াতের কাজে মূসা (আঃ)-কে সহায়তা করতে পারেন। এটি শুধু একটি ব্যক্তিগত সহায়তা নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াতী মিশনের অংশ ছিল। হারুন (আঃ)-র উপস্থিতি দাওয়াতকে শক্তিশালী করেছিল এবং তিনি মানুষের মধ্যে ঈমান ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।
হযরত হারুন (আঃ)-এর সহায়ক হিসেবে পাঠানো হওয়ার ব্যাপারটি কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَآخَاهُ هَارُونَ فَأَقْسَمَا بِاللَّهِ لَنُؤْمِنَنَّ
"তাঁর ভাই হারুনকেও আমরা পাঠালাম। তারা আল্লাহর নামে শপথ করলেন যে আমরা ঈমান আনব।" [165]

আল্লাহ তাআলা শুধু মূসা (আঃ)-কে নয়, তাঁর ভাই হারুন (আঃ)-কেও দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ মিশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রেরণ করেছেন। হারুন (আঃ)-র উপস্থিতি মূসা (আঃ)-র বক্তব্যকে সমর্থন করেছিল এবং মানুষকে আল্লাহর পথে আনার প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করেছে। [166]

দাওয়াতের উদ্দেশ্য

হারুন (আঃ)-র দাওয়াত মূলত চারটি লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে ছিল:

- তাওহীদ প্রচার - আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।
- নিশ্চিত বিশ্বাস ও ঈমানদার জীবনধারণ শেখানো - মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি নিশ্চিত করা।
- বনি ইস্রাঈলকে ন্যায় ও সততা শেখানো - সমাজে সততা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা।
- মূর্তি পূজা, শিরক ও অন্যায় থেকে বিরত রাখা - মানুষকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা।

হারুন (আঃ)-র উপস্থিতি মূসা (আঃ)-র দাওয়াতকে কার্যকর করতে সহায়ক হয়েছিল। তিনি কেবল নীতি বা নিয়ম প্রচার করতেন না, বরং নিজের চরিত্র ও ধৈর্য দিয়ে মানুষকে ঈমান ও নৈতিকতার দিকে আকৃষ্ট করতেন।

দাওয়াতের ধরণ ও পদ্ধতি

হযরত হারুন (আঃ) মূলত বনি ইস্রাঈলদের মধ্যে মূসা (আঃ)-কে সহায়তা করার জন্য পাঠানো হয়েছিলেন। তাঁর কাজ ছিল মূসা (আঃ)-র দাওয়াতকে শক্তিশালী করা এবং মানুষের ভুল সংশোধন করা। তিনি দাওয়াতের কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করে মানুষের ঈমান ও নৈতিকতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছিলেন। [167]

হারুন (আঃ) সবসময় ধৈর্য ধারণ করতেন। মানুষের সামনে শান্তভাবে দাওয়াত দিতেন এবং ঝগড়া বা জবরদস্তি ব্যবহার করতেন না। তিনি মূসা (আঃ)-র নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতেন, ফলে দাওয়াত আরও কার্যকর ও প্রভাবশালী হতো।

فَقَالَ مُوسَىٰ يَا أَخِي اشْدُدْ بِرُوبِي وَأَلْقِ
"মূসা বললেন - হে আমার ভাই! আমার লাঠি দৃঢ় করো এবং ফেল দাও।" [168]

---

[165] সূরা ত্বোহা (২০:৯২)

[166] ইবন কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া; তাফসীর আত-তাবারী, খণ্ড ১

[167] আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ১; তাফসীর আত-তাবারী, খণ্ড ১

[168] সূরা ত্বোহা ২০:৯৩

হারুন (আঃ)-কে সরাসরি দাওয়াতের কাজে অংশ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে নবী হিসেবে তাঁর কাজ ছিল আল্লাহর কথার প্রচার এবং মানুষের দাওয়াতের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা।

হযরত হারুন (আঃ)-র দাওয়াতের সফলতা

- দাওয়াতকে শক্তিশালী করা: হারুন (আঃ)-র উপস্থিতি মূসা (আঃ)-র দাওয়াতকে সমর্থন ও শক্তিশালী করেছে। তাঁর সহায়তায় মানুষ আরও সহজে ঈমান ও তাওহীদের দিকে আকৃষ্ট হয়।

- মানুষের ধৈর্য ও নৈতিকতা বৃদ্ধি: হারুন (আঃ) ধৈর্য ও সততার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার উদার ও শান্তিপূর্ণ দাওয়াত মানুষের মধ্যে নৈতিকতা ও ঈমানদার জীবনধারণের শিক্ষা যুগিয়েছে।

- শিরক ও অন্যায় থেকে বিরত রাখা: হারুন (আঃ) মূর্তি পূজা, শিরক এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে দাওয়াত প্রচার করেছেন। তাঁর দাওয়াত বনি ইস্রাঈলদের মধ্যে আল্লাহর পথে ফিরে আসার প্রেরণা জুগিয়েছে।

- মানুষকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা: হারুন (আঃ)-র কাজ মূলত সমাজকে আল্লাহর আদেশ মেনে চলার দিকে পরিচালিত করেছে। তিনি মানুষের মধ্যে ঈমান ও সততা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। [169]

فَقَالَ مُوسَىٰ يَا أَخِي اشْدُدْ بِرُوبِي وَأَلْقِ

"মূসা বললেন, হে আমার ভাই! আমার লাঠি দৃঢ় করো এবং ফেল দাও।" [170]

হারুন (আঃ)-র সহায়তায় মূসা (আঃ)-র দাওয়াত কার্যকর ও শক্তিশালী হয়েছে।

[169] ইবন কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া; তাফসীর আত-তাবারী, খণ্ড ১; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ১; তাফসীর আত-তাবারী, খণ্ড ১

[170] সূরা ত্বোহা ২০:৯৩

হযরত ঈসা (আঃ)

হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত নবী, যিনি মূলত বনী ইস্রাঈল জাতির প্রতি পাঠানো হয়েছিলেন। তাঁর জন্ম অত্যন্ত বরকতময় ও অলৌকিকভাবে ঘটেছিল। তিনি পবিত্র মরিয়ম (আঃ) এর পুত্র, যিনি কোরআনে সর্বোচ্চ মর্যাদায় বর্ণিত নারী। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এমন কিছু অলৌকিক ক্ষমতা দান করেছিলেন যা মানুষকে ঈমান ও ন্যায়পরায়ণ জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করত।
হযরত ঈসা (আঃ)-এর অলৌকিক ক্ষমতার মধ্যে প্রধান ছিল-

- মাতাকে জন্মের সময় সাহায্য করা।
- অসুস্থদের সুস্থ করা।
- অন্ধদের দেখার ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া।
- মৃতদের জীবিত করা।

এই অলৌকিক নিদর্শনগুলো মানুষের মধ্যে আল্লাহর শক্তি ও রহমতকে প্রদর্শন করত এবং মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করত।

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
"যখন ফেরেশতারা বললেন, হে মরিয়ম! আল্লাহ তোমাকে খুশির সংবাদ দিচ্ছেন। তার নাম হবে মসীহ ঈসা, মরিয়মের পুত্র। তিনি উভয় দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত হবেন।" [171]

হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবন ছিল ধৈর্য, সততা ও আল্লাহভক্তির নিদর্শন। তিনি মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন এবং নিজের জীবন দিয়ে দাওয়াতের সঠিক রূপ প্রদর্শন করতেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষকে সঠিক পথে আহ্বান করা এবং আল্লাহর ইবাদত ও ন্যায়পরায়ণ জীবনধারণের শিক্ষা দেওয়া। তাঁর দাওয়াতের উদ্দেশ্য চারটি প্রধান দিক থেকে বিবেচনা করা যায়ঃ

- তাওহীদ প্রচার - হযরত ঈসা (আঃ) মানুষকে শিক্ষা দিতেন যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি বারবার মানুষকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ও সন্তুষ্টি অর্জনের দিকে আহ্বান করতেন।

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا
"তিনি বললেন, আমি আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে গ্রন্থ প্রদান করেছেন এবং নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন।"
এখানে হযরত ঈসা (আঃ) স্পষ্টভাবে আল্লাহর দাস এবং নবী হিসেবে তার দায়িত্ব তুলে ধরেছেন। [172]

- সৎকাজ ও ন্যায়পরায়ণ জীবনধারণ শেখানো - হযরত ঈসা (আঃ) শুধু আল্লাহর ইবাদতই প্রচার করতেন না, বরং মানুষকে নৈতিক ও সামাজিকভাবে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপনের শিক্ষা দিতেন। তিনি সদাচরণ, দয়া, ন্যায়বিচার ও সহমর্মিতা মানুষের জীবনে অনুশীলনের দিকে গুরুত্বারোপ করতেন।
- মানুষকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা - হযরত ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত করে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনা। তিনি অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষকে ঈমানের পথে আকৃষ্ট করতেন।

- শিরক ও অন্যায় পরিহারের শিক্ষা - হযরত ঈসা (আঃ) শিরক, অবৈধ ও অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য বারবার সতর্ক করতেন। তিনি জানাতেন যে শিরক ও অন্যায় আল্লাহর সন্তুষ্টি নষ্ট করে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

[171] সূরা আলিমরান: ৪৫

[172] সূরা মারিয়াম: ৩০-৩১

হযরত ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা, সততা ও ন্যায়পরায়ণ জীবনধারণের শিক্ষা দেওয়া এবং শিরক ও অন্যায় থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধন করা। তাঁর জীবন ও অলৌকিক নিদর্শনগুলো এই বার্তাকে আরও শক্তিশালী ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিল।[173]

হযরত ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতের ধরণ

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর দাওয়াত মানুষকে সরাসরি পৌঁছে দিতেন। তিনি কেবল বক্তৃতা করতেন না, বরং নিজের জীবন ও কাজের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে আকৃষ্ট করতেন। দাওয়াতের ধরণ ছিল নির্ভীক, ধৈর্যশীল ও করুণাময়।

i. অসুস্থদের সুস্থ করা -

একবার কাসাসুল আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে, বনী ইস্রাঈলদের মধ্যে একজন গম্ভীর অসুস্থ রোগীকে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর ইচ্ছায় সুস্থ করে দেন। রোগী ও তার পরিবার অবাক হয়ে ঈমান স্থাপন করে। এটি কেবল রোগমুক্তির গল্প নয়, বরং মানুষের মধ্যে আল্লাহর শক্তি ও রহমতের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম ছিল।

ii. অন্ধদের দেখার ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া -

একবার একটি গ্রামে কিছু মানুষ অন্ধ ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) তাদের দিকে দৃষ্টি দিয়েই আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের দেখার ক্ষমতা ফিরিয়ে দেন। মানুষ অবাক হয়ে তাঁর আশেপাশে ভিড় জমায় এবং ঈমানের দিকে আগ্রহী হয়।[174]

iii. মৃতদের জীবিত করা -

কাসাসুল আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে, হযরত ঈসা (আঃ) একটি মৃত শিশুকে আল্লাহর ইচ্ছায় জীবিত করেন। শিশুর পরিবারকে তাওহীদ ও আল্লাহর শক্তি বোঝানোর জন্য এটি একটি নিদর্শন ছিল। মানুষ এটি দেখে অবাক হয় এবং নবীর বার্তাকে আরও শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নেয়।

iv. মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নে সাহায্য করা -

হযরত ঈসা (আঃ) শুধু অলৌকিক কাজেই সীমাবদ্ধ থাকতেন না। তিনি মানুষকে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, শিরক পরিহার ও আল্লাহভক্তি শেখাতেন। মানুষ তাঁর কাছ থেকে জীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করত।

দাওয়াতের মূল বৈশিষ্ট্য

- ধৈর্যশীল: যেসব মানুষ নবীর বার্তা বুঝতে অস্বীকার করত, তাদের সঙ্গে শান্তভাবে আচরণ করতেন।
- সততা ও আল্লাহভক্তি: দাওয়াত সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই দিতেন।
- অলৌকিক নিদর্শন: মানুষের বিশ্বাস ও ঈমান জোরদার করার জন্য তিনি অলৌকিক নিদর্শন দেখাতেন।[175]

হযরত ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতের সফলতা

হযরত ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াত মূলত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নে কেন্দ্রীভূত ছিল। তাঁর সফলতা বিভিন্ন দিক থেকে পরিমাপ করা যায় -

i. মানুষের ঈমান জাগানো:

[173] ইবন কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া; তাফসীর আত-তাবারী, খণ্ড ১

[174] কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায়: নবীদের অলৌকিক নিদর্শন।

[175] কাসাসুল আম্বিয়া (অধ্যায়: নবীদের দাওয়াত ও নিদর্শন); “Stories of the Prophets” – ইবনে কাসির

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর অলৌকিক নিদর্শন, অসুস্থকে সুস্থ করা, অন্ধকে দেখার ক্ষমতা দেওয়া, মৃতকে জীবিত করার মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট করতেন। অনেকেই তাঁর বার্তা গ্রহণ করে ঈমান স্থাপন করেছিল।

ii. সৎকাজ ও ন্যায়পরায়ণ জীবনচর্চা শেখানো:

মানুষকে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া এবং শিরক পরিহারের শিক্ষা দেওয়া হযরত ঈসা (আঃ)-এর গুরুত্বপূর্ণ সফলতা। এটি সমাজে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ঘটিয়েছিল।

iii. অলৌকিক নিদর্শনের মাধ্যমে দাওয়াতকে শক্তিশালী করা:

হযরত ঈসা (আঃ) কেবল বক্তৃতা বা তর্কে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি অলৌকিক নিদর্শনের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাসের আলো জ্বালাতেন।

iv. ধৈর্য ও সততার মাধ্যমে দাওয়াতের স্থায়িত্ব:

যেসব মানুষ প্রথমে তাঁর বার্তা গ্রহণ করত না, তাঁর ধৈর্য ও সততার কারণে অনেকেই পরবর্তীতে ঈমান ও ন্যায়পরায়ণ জীবন গ্রহণ করেছিল। [176]

হযরত ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতের সফলতা কেবল অলৌকিক কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের হৃদয়ে ঈমান জাগানো, নৈতিক উন্নয়ন ঘটানো এবং আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করাই তাঁর আসল সফলতা।

[176] কাসাসুল আম্বিয়া – হযরত ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াত ও অলৌকিক নিদর্শন

হযরত মুহাম্মদ ﷺ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ কুরাইশ উপজাতির বনু হাশিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এ পরিবারটি ছিল মক্কার অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাশালী এক পরিবার। তাঁর পিতা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও মাতা ছিলেন আমিনা বিনতে ওয়াহ্‌ব। তাঁর জন্ম হয় মক্কার এক পবিত্র স্থানে, রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখে (প্রায় ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে) [177]

শৈশবকালেই তিনি পিতৃহীন হন এবং মাত্র ছয় বছর বয়সে মাতাও ইন্তেকাল করেন। এরপর তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁকে লালন-পালন করেন এবং দাদা ইন্তেকালের পর চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে বড় হন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত শান্ত, বিচক্ষণ ও সৎচরিত্র এক শিশু। তাঁর মুখে কখনও মিথ্যা শোনা যেত না, কখনও অন্যায় দেখা যেত না। এজন্য তাঁকে মানুষ ‘‘আল-আমীন’’ অর্থাৎ বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী উপাধিতে ডাকত। [178]

কৈশোরে তাঁর চরিত্রে ছিল গভীর চিন্তাশীলতা ও নম্রতা। তিনিও যুবক অবস্থায় বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেন ও চাচা আবু তালিবকে সহায়তা করতেন। ব্যবসায়ে তাঁর সততা ও ন্যায়পরায়ণতা দেখে মানুষ অভিভূত হত। এই কারণেই খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে নিজের বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব দেন এবং পরবর্তীতে তাঁর সাথে বিবাহ সম্পন্ন হয়। [179]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল। আল্লাহ তাআলা তাঁর মাধ্যমে মানবজাতির জন্য দাওয়াতের পূর্ণতা দান করেছেন। তাঁর জীবন ছিল রহমত, ন্যায়, সত্য ও শান্তির প্রতীক। তিনি আল্লাহর একত্ব প্রচার ও মানবতার পথে অটল থাকার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেন। [180]

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

‘‘আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সমস্ত জগতের জন্য রহমত হিসেবে।’’ [181]

এইভাবে নবীজীর জীবন ছিল এক পরিপূর্ণ রহমত, যেখান থেকে মানবজাতি শিখেছে সত্য, ধৈর্য, প্রেম ও আল্লাহর নৈকট্যের অর্থ।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর দাওয়াতের মূল লক্ষ্য

হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর দাওয়াতের মূল লক্ষ্য ছিল মানবজাতিকে আল্লাহর একত্বের পথে ফিরিয়ে আনা এবং মানুষের জীবনকে আল্লাহর বিধি ও নৈতিকতার আলোকে পরিচালিত করা। তাঁর আহ্বান ছিল কেবল আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় নয়, বরং মানব সমাজে ন্যায়, সততা, ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যপূর্ণ। [182]

নবীজি ﷺ মানুষের চরিত্র ও সমাজের দুর্বল দিকগুলো বোঝার মাধ্যমে দাওয়াত দিতেন।তিনি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে মানুষের মন ও হৃদয়ে আল্লাহর স্নেহ ও রহমতের বাণী পৌঁছে দিতেন। তাঁর দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষ শিখত যে, জীবন কেবল জগতীয় মায়া নয়, বরং আখিরাতের দায়বদ্ধতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম।[183]

নবীজীর দাওয়াতের মূল বিষয়গুলো ছিল -

- আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই

[177] কাসাসুল আম্বিয়া - ইবন কাসির

[178] আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ - ইবন হিশাম

[179] আর-রাহীকুল মাখতূম

[180] তাফসির ইবন কাসির - সূরা আল-আমবিয়া, আয়াত ১০৭

[181] সূরা আল-আমবিয়া: ১০৭

[182] কাসাসুল আম্বিয়া - ইবন কাসির

[183] আর-রাহীকুল মাখতূম

নবীজি ﷺ মানুষকে শেখাতেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো সৃষ্টি উপাস্য হতে পারে না। এই তাওহীদ বিশ্বাসই মুক্তির একমাত্র পথ। মানুষের জীবনের সমস্ত কার্যক্রম, যেমন নৈতিকতা, আচরণ ও ন্যায়পরায়ণতা, আল্লাহর আজ্ঞার প্রতি আনুগত্যের ওপর নির্ভর করে। তিনি মানুষের মনে স্থায়ী বিশ্বাস স্থাপন করতেন যে, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং প্রতিটি জীবনের নিয়ন্ত্রক।

- সৎকাজ, ন্যায়পরায়ণতা ও নৈতিকতা চর্চা

নবীজি ﷺ দাওয়াত দিতেন কেবল আল্লাহর ইবাদতের জন্য নয়, বরং মানুষের চরিত্র ও আচরণের মান উন্নয়নের জন্য। তিনি মানুষকে সততা, বিনয়, করুণা, ধৈর্য ও ন্যায়পরায়ণতা অনুশীলনের শিক্ষা দিতেন। দাওয়াতের মাধ্যমে তিনি সমাজে সৎ কাজ ও নৈতিক জীবনধারার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন, যাতে মানুষ নিজ ও অন্যের প্রতি দায়িত্বশীল হয়। [184]

- অন্যায়, শিরক ও পাপাচার থেকে দূরে থাকা

নবীজি ﷺ তাঁর দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করতেন - শিরক, জুলুম, অসদাচরণ ও অন্যায় থেকে দূরে থাকার। মানুষকে শেখানো হত কেবল আল্লাহর প্রতি আনুগত্য নয়, সামাজিক ও নৈতিক কর্তব্যও পালন করতে হবে। তিনি বিশ্বাসীদের সতর্ক করতেন যে, সমাজের অসঙ্গতি ও অবিচার মানুষের জীবন ও আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর।

- আখিরাতের জবাবদিহিতা ও আল্লাহর রহমতের প্রতি সচেতন থাকা

নবীজি ﷺ মানুষের দাওয়াতের মাধ্যমে আখিরাতের সজাগতা বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন। তিনি বুঝাতেন, এই জীবনের কর্মকাণ্ডের ফল পরকালেও দেখা যাবে। আল্লাহর রহমতের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি উৎসাহ দিতেন, যাতে মানুষ দয়া, ক্ষমাশীলতা ও ন্যায়পরায়ণ আচরণকে জীবনের নিয়মে রূপান্তরিত করে।

নবীজি ﷺ-এর দাওয়াত কেবল ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি মানবজাতির নৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার সর্বজনীন আহ্বান। তাঁর দাওয়াতের ফলে মানুষ না শুধু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক শক্ত করেছিল, বরং নিজের ও সমাজের উন্নতির পথও পেয়েছিল। [185]

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ

"বলুন, আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমি আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কোনো অংশীদার না করি।" [186]

হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর দাওয়াতের ধরণ ও পদ্ধতি

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের প্রতি দাওয়াত দিতেন এমনভাবে যা সরাসরি ও পরোক্ষ উভয়ই প্রভাব বিস্তার করতো।

- সরাসরি দাওয়াত - মানুষের সঙ্গে কথা বলা, উদাহরণ দেওয়া এবং নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর পথে আহ্বান।
- পরোক্ষ দাওয়াত - নিজের জীবন ও আচরণের মাধ্যমে শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন।

নবীজি ﷺ তাঁর দাওয়াতে ব্যবহার করতেন বিভিন্ন পদ্ধতি -

I. শিক্ষণীয় বক্তব্য ও উদাহরণ -

নবীজি ﷺ মানুষকে আল্লাহর একত্ব, নৈতিকতা, সততা ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সরল ভাষায় বোঝাতেন। উদাহরণ ও মিসালের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়কে আঘাত করতেন যেন তারা সহজে বার্তাটি গ্রহণ করতে পারে। প্রায়ই প্রকৃতির নিদর্শন, জীবজন্তু ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা ব্যবহার করতেন। [187]

II. আচরণ ও জীবনদৃষ্টান্ত

[184] আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ - ইবন হিশাম

[185] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া - ইবন হিশাম

[186] সূরা আর-রাদ: আয়াত ৩৬

[187] আর-রাহীকুল মাখতূম, অধ্যায় "দাওয়াতের পদ্ধতি"

নবীজি ﷺ-এর জীবনের প্রতিটি কাজই দাওয়াতের অংশ ছিল। তিনি সবসময় সততা, নম্রতা, ধৈর্য, সহমর্মিতা এবং ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করতেন। মানুষ তাঁর চরিত্র দেখে আল্লাহর পথে আকৃষ্ট হত। [188]

III. ধৈর্য ও নম্রতার সঙ্গে আহ্বান

নবীজি ﷺ কখনো মানুষকে জোরপূর্বক দাওয়াত দিতেন না। তিনি সবসময় ধৈর্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে মানুষকে বোঝাতেন, ভুল সংশোধন করতেন এবং তাদের প্রতি সদয় হতেন। [189]

IV. কথা, কাজ ও উদাহরণের সমন্বয়

নবীজি ﷺ-এর দাওয়াত সর্বদা কথা, কাজ ও উদাহরণের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। মানুষ দেখত তাঁর সহমর্মিতা, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা। [190]

V. প্রকৃত দৃষ্টান্ত ও সামাজিক প্রভাব

নবীজি ﷺ দাওয়াত দিতেন যাতে সমাজে ন্যায়, সহমর্মিতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা সরাসরি আহ্বানে সাড়া দিত না, তাদের সঙ্গেও উদারতা, করুণা এবং ন্যায়পরায়ণ আচরণ বজায় রাখতেন। [191]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।" [192]

হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর দাওয়াতের সফলতা ও মানুষের প্রতিক্রিয়া

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতিকে আল্লাহর একত্ব ও নৈতিক জীবনধারায় ফিরিয়ে আনা। এই দাওয়াত সমাজে অনেকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। [193]

- সাহাবাদের মধ্যে সাড়া

নবীজি ﷺ-এর দাওয়াত শুরুতে কয়েকজন মানুষের মধ্যেই গ্রহণযোগ্যতা পায়। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা, আলী ইবন আবু তালিব, জ্বাদ ইবন মুহাররির মতো যুবকরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামের প্রথম অনুসারী হন। তারা নবীজীর চরিত্র ও সততা দেখে প্রভাবিত হয়। এই গ্রুপটি পরবর্তীতে ইসলাম সম্প্রসারণের মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে। [194]

- কুরাইশের প্রতিক্রিয়া

প্রাথমিকভাবে কুরাইশের বড় ও প্রভাবশালীরা নবীজীর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা আল্লাহর একত্বের বার্তাকে শিরক ও সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে মনে করেছিল। নবীজি ﷺ-এর সততা, নম্রতা এবং ধৈর্য থাকা সত্ত্বেও, তারা তাকে অবমাননা, অপমান ও

---

188 আল-সীরাতুন নববিয়্যাহ, অধ্যায় "চরিত্র ও দাওয়াতের উদাহরণ"

189 আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, অধ্যায় "দাওয়াত ও ধৈর্য"

190 কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায় "দাওয়াতের কার্যকারিতা"

191 আর-রাহীকুল মাখতূম, অধ্যায় "সমাজে দাওয়াতের প্রভাব"

192 সূরা আন-নাহল: আয়াত ১২৫

193 আর-রাহীকুল মাখতূম, অধ্যায় "দাওয়াতের উদ্দেশ্য ও প্রভাব"

194 আল-সীরাতুন নববিয়্যাহ, অধ্যায় "সাহাবাদের ইসলাম গ্রহণ"

কুৎসা করেছিল। তাদের প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করেছিল যে, দাওয়াত শুধু আল্লাহর ইবাদতের বার্তা নয়, বরং সামাজিক পরিবর্তনের আহ্বানও। [195]

- দাওয়াতের ধীর কিন্তু দৃঢ় সম্প্রসারণ

নবীজি ﷺ ধৈর্যশীলতার সঙ্গে দাওয়াত চালিয়ে যান। ধীরে ধীরে মানুষ তাঁর শিক্ষার প্রভাব অনুভব করে। নৈতিকতা, সততা, ধৈর্য ও উদার আচরণ দেখে অনেকেই ইসলামের পথে ফিরে আসে। বিশেষ করে গরীব, নিপীড়িত ও জ্ঞানপ্রিয় মানুষ নবীজীর দাওয়াত গ্রহণ করে। [196]

- সমাজ ও নৈতিক প্রভাব

নবীজি ﷺ-এর দাওয়াতের ফলে কেবল ব্যক্তি স্তরে নয়, সমাজের মানসিকতা ও আচরণেও পরিবর্তন আসে। শিরক, অন্যায় ও অবিচার কমতে শুরু করে। মানুষ ন্যায়পরায়ণ ও মানবিক জীবনের মূল্য বোঝে। এই পরিবর্তন পরবর্তীতে মদিনায় ইসলামের শক্তিশালী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার ভিত্তি তৈরি করে। [197]

- আল্লাহর সাহায্য ও দাওয়াতের সাফল্য

কুরআনে আল্লাহ বলেন যে, নবীজীর দাওয়াত মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর প্রভাব সৃষ্টি করে। অনেকেই নবীজীর আহ্বানে বিশ্বাস করে, ধর্ম গ্রহণ করে এবং আল্লাহর পথে সৎকর্মে নিয়োজিত হয়। এটি প্রমাণ করে যে, দাওয়াত মানুষের জীবন ও সমাজকে পরিবর্তন করার শক্তি রাখে।

আল্লাহ তা`আলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সমস্ত জগতের জন্য রহমত হিসেবে।" [198]

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন আমাদের জন্য দাওয়াতের পদ্ধতি, ধৈর্য, নৈতিকতা ও সমাজ পরিবর্তনের মূল্য শেখায়।

নবীজী ﷺ-এর জীবন থেকে দাওয়াতের শিক্ষা

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন আমাদের জন্য দাওয়াতের পদ্ধতি, ধৈর্য, নৈতিকতা ও সমাজ পরিবর্তনের মূল্য শেখায়।

i. সততা ও বিশ্বস্ততার শিক্ষা

নবীজি ﷺ শৈশব থেকেই সততা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর চরিত্র মানুষকে আকৃষ্ট করত এবং দাওয়াত গ্রহণে সহায়ক হতো। [199]

দাওয়াতে বিশ্বাসযোগ্যতা ও সততা অপরিহার্য।

ii. ধৈর্য ও স্থিরচেতনার শিক্ষা

[195] কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায় "কুরাইশের প্রতিক্রিয়া"

[196] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, অধ্যায় "দাওয়াতের সম্প্রসারণ"

[197] আল-সীরাতুন নববিয়্যাহ, অধ্যায় "সমাজে নৈতিক প্রভাব"

[198] সূরা আল-আনবিয়া: আয়াত ১০৭

[199] আর-রাহীকুল মাখতূম - নবীজীর শৈশব ও চরিত্র

দাওয়াত শুরুতে অনেকেই নবীজীর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তিনি সবসময় ধৈর্যশীল থেকে নম্রতার সঙ্গে দাওয়াত চালিয়ে যান।[200]
প্রতিকূলতার মুখে ধৈর্য ও স্থিরচেতনা গুরুত্বপূর্ণ।

iii. নম্রতা ও উদার আচরণের শিক্ষা

নবীজি ﷺ কখনো মানুষকে জোরপূর্বক দাওয়াত দিতেন না। নম্রতা, সহমর্মিতা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে মানুষকে বোঝাতেন।[201]
দাওয়াতের জন্য সদয় ও নম্র হওয়া প্রয়োজন।

iv. কথার সঙ্গে কাজের সমন্বয়

নবীজি ﷺ শুধু আহ্বান দিতেন না, তাঁর জীবন ও কাজই দাওয়াতের জীবন্ত উদাহরণ ছিল। সততা, ধৈর্য, ন্যায়পরায়ণতা ও সহানুভূতিশীল আচরণ মানুষকে প্রভাবিত করত।[202]
দাওয়াতের জন্য নিজের আচরণ ও চরিত্রও শিক্ষার অংশ।

v. সমাজে পরিবর্তন আনার শিক্ষা

নবীজি ﷺ-এর দাওয়াত ব্যক্তিগত নৈতিকতার পাশাপাশি সমাজে ন্যায় ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছিল। শিরক, অন্যায় ও অবিচার কমে, ন্যায়পরায়ণ সমাজ গড়ে ওঠে।[203]
দাওয়াতের লক্ষ্য শুধু ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক উন্নয়নও।

vi. সহমর্মিতা ও মানবিকতার শিক্ষা

নবীজি ﷺ সকলের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল ছিলেন, বিশেষ করে গরীব, নিপীড়িত ও অসহায়দের প্রতি।[204]
দাওয়াত মানবিকতা ও সহানুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

vii. দাওয়াতের সার্বজনীনতা

নবীজি ﷺ বলেন, দাওয়াত সকল মানুষের জন্য। কোনো জাতি, বর্ণ বা সামাজিক শ্রেণি এতে অগ্রাধিকার পায় না।[205]
দাওয়াত সর্বজনীন এবং সীমাবদ্ধ নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর।"[206]

---

[200] আল-সীরাতুন নববিয়্যাহ - দাওয়াতের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া

[201] আল-সীরাতুন নববিয়্যাহ - নবীজীর নম্রতা ও প্রজ্ঞা

[202] আর-রাহীকুল মাখতূম - দাওয়াতের জীবন্ত উদাহরণ

[203] কাসাসুল আম্বিয়া - সমাজে দাওয়াতের প্রভাব

[204] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া - নবীজীর সহমর্মিতা

[205] কাসাসুল আম্বিয়া - নবীজীর দাওয়াতের সার্বজনীনতা

[206] সূরা আন-নাহল: আয়াত ১২৫

দাওয়াতের পদ্ধতি ও কৌশল

প্রজ্ঞা, উত্তম উপদেশ ও যুক্তি তর্কের মাধ্যমে দাওয়াত

প্রজ্ঞা (হিকমাহ)

"হিকমাহ" (اَلْحِكْمَةَ) বলতে বোঝায় — জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিক কথা বলা এবং কাজ করা।

আল্লাহ বলেন -

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ...

"তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞার মাধ্যমে।" [207]

অর্থাৎ - দাওয়াত দিতে হবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে, এমনভাবে যেন তা যুক্তিসঙ্গত হয়, কাউকে অপমান না করে, বরং তার বিবেক জাগ্রত করে।

নবীদের জীবনে হিকমাহর উদাহরণ -

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন দাওয়াতের ক্ষেত্রে যুক্তি ও প্রজ্ঞার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তাঁর জাতি সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্রকে উপাস্য মনে করত। তিনি তাদের বিশ্বাসের অযৌক্তিকতা বুঝিয়ে দিতে ক্রমধারায় যুক্তি-তর্ক ও চিন্তাশীল উদাহরণ উপস্থাপন করেছিলেন।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ

"যখন রাত তাঁকে ঢেকে ফেলল, তিনি একটি তারা দেখলেন। বললেন, 'এটাই কি আমার প্রভু?' কিন্তু যখন সেটি অস্ত গেল, তিনি বললেন, 'আমি তাদেরকে ভালোবাসি না যারা অস্ত যায়।' [208]

এরপর তিনি একইভাবে চাঁদ ও সূর্যের ক্ষেত্রেও বলেছিলেন, যখন সূর্য অস্ত গেল, তিনি বললেন –

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম তাঁর দিকে যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, একনিষ্ঠভাবে, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" [209]

ইব্রাহীম (আঃ)-এর এই বক্তব্যগুলো তর্ক নয়, বরং হিকমাহ-পূর্ণ যুক্তি। তিনি তাঁর জাতির অন্ধবিশ্বাসকে ভেঙে দিচ্ছেন তাদেরই যুক্তি দিয়ে। তিনি প্রথমে তাদের চিন্তার ধারা মেনে নিয়ে প্রশ্ন করেন, "এটাই কি আমার রব?" এরপর ধীরে ধীরে দেখালেন, যে বস্তু নিজেই অস্ত যায়, সে কিভাবে চিরস্থায়ী রব হতে পারে?

[207] সূরা আন-নাহল ১৬:১২৫

[208] সূরা আল-আন'আম ৬:৭৬

[209] সূরা আল-আন'আম ৬:৭৯

"ইব্রাহীম (আঃ) তার জাতিকে শেখাতে চেয়েছিলেন যে, আল্লাহর সত্তা এমন, যিনি কখনো বিলুপ্ত হন না। তিনি তাদের চিন্তাকে জাগিয়ে তোলার জন্য এই উদাহরণ ব্যবহার করেছিলেন।" [210]

হযরত মূসা (আঃ) কে আল্লাহ তাঁকে ও হারুনকে আদেশ দেন, "তোমরা ফেরাউনের কাছে যাও, কিন্তু তার সাথে কোমলভাবে কথা বলো।"

অর্থাৎ প্রজ্ঞার ব্যবহার। কারণ কঠোরভাবে বললে সে অহংকারে ডুবে যাবে; নরমভাবে বললে চিন্তা করবে। [211]

উত্তম উপদেশ (মাওইযাহ হাসানাহ)

"মাওইযাহ হাসানাহ" মানে এমন উপদেশ যা হৃদয় স্পর্শ করে, কোমল ভাষায় বলা হয়, যাতে শ্রোতা চিন্তা করে ও অনুপ্রাণিত হয়।

আল্লাহ বলেন -

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ

"তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।" [212]

নবীদের জীবনে উত্তম উপদেশের উদাহরণ -

হযরত নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর তাঁর জাতিকে উপদেশ দিয়েছেন, বলেছিলেন, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।" তিনি ধৈর্য ও কোমলভাবে আহ্বান করেছেন; রাত-দিন গোপনে ও প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছেন। [213]

হযরত সালিহ (আঃ) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, "হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য নেই।" তিনি তাদের আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। [214]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার কাফেরদের এবং সাহাবাদের উপদেশ দিতেন এমনভাবে যে শ্রোতার হৃদয় নরম হয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাওয়াত দিতেন এমনভাবে, যা শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করত। তাঁর উপদেশ ছিল কোমল, হৃদয়গ্রাহী এবং জীবনঘনিষ্ঠ। তিনি কখনো কঠোর ভাষা ব্যবহার করতেন না; বরং দয়া, ধৈর্য ও নম্রতায় পরিপূর্ণ উপদেশ দিতেন।

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

[210] তাফসির ইবন কাসীর, আনআম ৬:৭৬-৭৯

[211] তাফসির কুরতুবি, তাফসির ইবন কাসীর - সূরা ত্বাহা: ৪৪

[212] সূরা আন-নাহল: ১২৫

[213] কাসাসুল আম্বিয়া, ইবনে কাসীর

[214] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর

"তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র ও ব্যবহার তার পরিবারের সঙ্গে উত্তম; আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের সঙ্গে উত্তম আচরণকারী।" [215]

এই হাদীসটি শুধু নৈতিকতার দিকেই নয়, বরং দাওয়াতের কৌশলের দিকেও ইঙ্গিত দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আখলাক ও মৃদুভাষী আচরণের মাধ্যমেই বহু মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন। তাঁর দাওয়াতে কখনো তিরস্কার, অপমান বা রূঢ়তা ছিল না বরং তিনি প্রতিটি মানুষকে তাদের অবস্থান বুঝে নরমভাবে বুঝিয়ে দিতেন। "নবী ﷺ দাওয়াতের ক্ষেত্রে এমনভাবে কথা বলতেন, যেন শ্রোতা নিজেই ভাবতে শুরু করে। তাঁর মুখের কথা যেমন মিষ্টি, তেমনি চরিত্রের সৌন্দর্য মানুষকে আকৃষ্ট করত।" [216]

দাওয়াত শুধু মুখের কথা নয়, চরিত্রের প্রতিফলনও বটে।

যুক্তি-তর্ক (জাদিলহুম বিল্লাতি হিয়া আহসান)

"জিদাল" মানে বিতর্ক, তবে "বিল্লাতি হিয়া আহসান" মানে - এমনভাবে বিতর্ক করা যা উত্তম, নম্র ও যুক্তিসঙ্গত। দাওয়াতের উদ্দেশ্য হলো জয় নয়, বরং হেদায়েত।

নবীদের জীবনে যুক্তি-তর্কের উদাহরণ -

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জাতিকে যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন।

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا

"তোমরা তো আল্লাহ ব্যতীত মূর্তিসমূহের উপাসনা করছ এবং মিথ্যা তৈরি করছ। আল্লাহ ছাড়া যাদের তোমরা উপাসনা কর, তারা তোমাদের জন্য রিজিকের মালিক নয়।" [217]

এভাবে তিনি যুক্তি ব্যবহার করে বুঝিয়েছিলেন যেসব বস্তুর নিজের কোনো ক্ষমতা নেই, তারা ইলাহ হতে পারে না। [218]

হযরত ঈসা (আঃ) যখন ইসরাঈল বংশ তাঁকে কেবল একজন মানুষ হিসেবে গণ্য করত বা অতিরিক্তভাবে ঈশ্বর বলত, তিনি যুক্তি দিয়ে বলতেন "নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদের রব; অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।" [219]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের সঙ্গে যুক্তি-তর্ক করতেন, কিন্তু কখনো কাউকে অপমান করতেন না। তাঁর লক্ষ্য ছিল হেদায়েত, অর্থাৎ মানুষের হৃদয় ও বুদ্ধিকে আল্লাহর সত্যের দিকে আহ্বান করা।

মক্কার মুশরিকরা বিভিন্ন প্রতীক, মূর্তি ও স্বপ্নের মাধ্যমে তাদের প্রভুর ধারণা করত। তারা প্রায়শই নবী ﷺকে জিজ্ঞেস করতঃ "আল্লাহ কে?" তাদের প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল জানার পাশাপাশি নবীকে কষ্ট দেওয়া বা তাঁর যুক্তি খণ্ডন করা। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে সূরা আল-ইখলাস নাযিল হয়। এর প্রথম আয়াত:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

[215] সহিহ বুখারী, হাদিস ৬০২৯

[216] তাফসির ইবন কাসীর ও আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া

[217] সূরা আল-আনকাবুত: আয়াত ১৭

[218] তাফসির ইবন কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া – ইবন কাসীর

[219] কাসাসুল আম্বিয়া, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া - সূরা আলে ইমরান: ৫১

"বল, তিনি আল্লাহ এক।" [220]

নবী ﷺ মুশরিকদের সঙ্গে বিতর্ক করতেন শান্তিপূর্ণ ও নম্রভাবে, যাতে তারা বিরক্ত বা রেগে না যায়। সূরা ইখলাসে ব্যবহৃত "أَحَدٌ" শব্দটি নির্দেশ করে আল্লাহর একত্ব, যা কোনো দর্শন বা দার্শনিক তর্ক নয়, বাস্তব ধর্মীয় সত্য। নবী ﷺ-এর দাওয়াতের মূল কৌশল হলো সংক্ষিপ্ত, প্রজ্ঞাপূর্ণ, যুক্তি-ভিত্তিক ও নম্র। [221]

প্রজ্ঞা, উত্তম উপদেশ ও যুক্তি তর্কের মাধ্যমে নবীদের দাওয়তের কিছু উদাহরণ –

হযরত ইসা (আঃ) আল্লাহর নিকট থেকে দূত হিসেবে পাঠানো হয়েছিলেন ইসরাঈল বংশের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সৎপথে ফিরিয়ে আনা এবং তাদেরকে আল্লাহর একত্ব ও উপাসনার দিকে আহ্বান করা। তিনি বলেন,

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ

"হে ইসরাঈল বংশ! আল্লাহর ইবাদত কর, আমি তোমাদের প্রতি তাঁর দূত।" [222]

হযরত ইসা (আঃ) দাওয়াতের সময় প্রজ্ঞার ব্যবহার করেছিলেন। তিনি মানুষের অবস্থা ও সামাজিক পরিবেশ বুঝে আহ্বান দিতেন। উদাহরণস্বরূপ, ইসরাঈল বংশের মানুষদের দিকেই তিনি সরাসরি বলেছিলেন যে আল্লাহর প্রতি ফিরে আসা ও তাঁর ইবাদত করা তাদের কল্যাণের জন্য। তিনি সরাসরি বা কঠোরভাবে নয়, বরং মানুষের বুদ্ধি ও হৃদয় বিবেচনা করে দাওয়াত উপস্থাপন করেছেন। [223]

হযরত ইসা (আঃ) দাওয়াত দিতেন নম্র ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায়, যা মানুষকে ভাবিয়ে তোলার জন্য উপযুক্ত। তাঁর আহ্বান কখনো হিংস্র বা চাপের মাধ্যমে ছিল না।

"হে ইসরাঈল বংশ! আল্লাহর ইবাদত কর" - এই বক্তব্যে সহজ, স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। এটি মানুষের মনকে প্রভাবিত করে, যাতে তারা ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হয়। [224]

হযরত ইসা (আঃ) দাওয়াতের সময় যথাযথ যুক্তি ও প্রমাণ ব্যবহার করতেন। যদি কেউ আল্লাহর একত্ব বা তাঁর দূতের সত্যতা নিয়ে সংশয় বা ভুল ধারণা পোষণ করত, তিনি প্রমাণসহ যুক্তি উপস্থাপন করতেন, যা বিতর্ককে নরম ও শিক্ষামূলক বানাত। তিনি সরাসরি নিজেকে আল্লাহর দূত হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন, যা তাদেরকে বিতর্ক থেকে বের করে সৎপথের দিকে ফিরিয়ে আনে। [225]

এই তিনটি গুণ একত্রিত করে হযরত ইসা (আঃ) তাঁর দাওয়াতকে সর্বোত্তম ও কার্যকর করেছেন।

হযরত সালিহ (আঃ) ছিলেন সামুদ জাতির নবী। থামুদ জাতি ছিল সমৃদ্ধ, উন্নত ও স্থাপত্যে পারদর্শী এক সম্প্রদায়। তারা পাহাড় কেটে ঘরবাড়ি নির্মাণ করত এবং নিজেদের শক্তি ও জ্ঞানে গর্ব করত। হযরত সালিহ আঃ তাদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে দাওয়াত দেন, বলেন ,

---

220 সূরা আল-ইখলাস: ১

221 তাফসির ইবন কাসীর; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া - ইবনে কাসীর

222 সূরা আলে ইমরান ৩:৫০–৫১

223 কাসাসুল আম্বিয়া, ইবনে কাসীর

224 তাফসির ইবন কাসীর

225 কাসাসুল আম্বিয়া, ইবনে কাসীর

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي " قَرِيبٌ مُّجِيبٌ"

"হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। তিনি তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে স্থায়ী করেছেন। অতএব তাঁর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর নিকট তাওবা করো।"[226]

হযরত সালিহ (আঃ) তাঁর জাতির প্রকৃতি ও মানসিকতা গভীরভাবে বুঝতেন। সামুদ জাতি ছিল অহংকারী, নিজেদের শক্তিকে গর্বের কারণ মনে করত। তাই তিনি সরাসরি তাদের গর্বের বিষয়গুলো নিয়েই যুক্তি উপস্থাপন করেন।

তিনি তাদের বলেন তোমাদের যে ভূমি, পাহাড়, ঘরবাড়ি, এগুলোর মালিক তোমরা নও; বরং আল্লাহই এগুলো তোমাদের ব্যবহার উপযোগী করে দিয়েছেন। এই উপায়ে তিনি তাদের মনোভাবকে নরম করতে চেয়েছিলেন। এটি ছিল হিকমাহ (প্রজ্ঞা) যেখানে নবী তাদের চিন্তা ও সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কথা বলেন, যাতে দাওয়াত প্রভাব ফেলতে পারে।[227]

হযরত সালিহ (আঃ) দাওয়াতের সময় কঠোর ভাষা ব্যবহার করেননি। তিনি তাদের হৃদয়ে প্রভাব ফেলতে চেয়েছিলেন কোমল, বিনয়ী ও আধ্যাত্মিক ভাষায়। তিনি বলেছিলেন, "তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

তাঁর কথায় ছিল ভালোবাসা, দয়া ও কল্যাণ কামনা। তিনি কখনো হুমকি দিয়ে নয়, বরং আল্লাহর রহমতের দিক স্মরণ করিয়ে দিয়ে দাওয়াত দিতেন। এভাবে তিনি উত্তম উপদেশ -এর মাধ্যমে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন।[228]

যখন তাঁর জাতি তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে উপহাস করল এবং বলল "তুমি তো আমাদেরই একজন, আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব কিসে?" তখন সালিহ (আঃ) যুক্তি দিয়ে বললেন, "হে আমার জাতি! তোমরা ভেবে দেখো, আমি যদি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাই, তবে কি আমি তা গোপন করতে পারি?"এভাবে তিনি প্রমাণ ও যুক্তির মাধ্যমে নিজের নবুওয়াত প্রতিষ্ঠা করেন।

পরে আল্লাহর নির্দেশে তাঁর জাতির জন্য একটি বিশেষ নিদর্শন পাঠানো হয় 'উটনী' যা ছিল অলৌকিক নিদর্শন। তিনি বলেছিলেন-

"এই উষ্ট্রী আল্লাহর নিদর্শন। তাকে আল্লাহর ভূমিতে শান্তিতে চারণ করতে দিও।"

কিন্তু সামুদ জাতি সেই উটনীকে হত্যা করে ফেলে। এতে আল্লাহর আজাব তাদের উপর নেমে আসে। এখানে নবীর যুক্তি-তর্ক ও প্রমাণভিত্তিক আহ্বান স্পষ্ট- প্রথমে যুক্তি, পরে অলৌকিক নিদর্শন, এবং শেষে সতর্কবার্তা।[229]

এভাবে তিনি এক উৎকৃষ্ট দাওয়াতদাতার রূপে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

হযরত হুদ (আঃ) আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 'আদ জাতির প্রতি প্রেরিত নবী ছিলেন। 'হযরত হুদ (আঃ) অত্যন্ত প্রজ্ঞা, নম্রতা এবং যুক্তি-ভিত্তিক দাওয়াত দিয়ে তাদের সত্যের পথে আহ্বান করেছিলেন। হযরত হুদ (আঃ) তাঁর দাওয়াত শুরু করেন এমনভাবে, যা তার জাতির মনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি প্রথমেই তাদের অতীতের সাফল্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আল্লাহ তাদের শক্তিশালী দেহ, উন্নত সভ্যতা ও উন্নত জীবনযাত্রা দিয়েছেন। এরপর তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন,

[226] সূরা হুদ: ৬১

[227] তাফসির কুরতুবি; কাসাসুল আম্বিয়া, ইবনে কাসীর

[228] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর; তাফসির তাবারী

[229] কাসাসুল আম্বিয়া, তাফসির ইবন কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ

"তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনা করছ।"[230]

এই আয়াতের মাধ্যমে তিনি হিকমাহ বা প্রজ্ঞা ব্যবহার করেন - সরাসরি নিন্দা না করে, বরং আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে তাদের অন্তরে তাগিদ জাগিয়ে তোলেন। তিনি তাদের সামাজিক মানসিকতা ও সংস্কৃতি বিবেচনা করে এমন ভাষায় কথা বলেন, যা তাদের কাছে যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য শোনায়।[231]

হযরত হুদ (আঃ) তাঁর জাতির প্রতি দাওয়াত দিতেন বিনয়, সহানুভূতি ও আন্তরিকতার সাথে। তিনি তাদের উদ্দেশে বলেছিলেন,

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ

"হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, তারপর তাঁর দিকে ফিরে আসো। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অতীব দয়ালু, প্রেমময়।"[232]

এটি ছিল উত্তম উপদেশের এক অসাধারণ উদাহরণ। তিনি জনগণকে আল্লাহর রহমতের আশা দেখিয়েছেন, ভয় নয় যাতে তাদের হৃদয় নরম হয় এবং তারা তাওবার দিকে ফিরে আসে। এই কোমলতা, ধৈর্য ও নম্রতাই ছিল তাঁর দাওয়াতের মূল আকর্ষণ।[233]

যখন 'আদ জাতি অহংকারভরে বলল, "হে হুদ! তুমি তো আমাদের মতোই একজন মানুষ, আমরা তোমার উপর বিশ্বাস করি না।" তখন হযরত হুদ (আঃ) তাদের যুক্তিসহ জবাব দিলেন, "আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ (বাইয়্যিনাহ) পেয়েছি, এবং তিনি আমাকে রহমত দান করেছেন। তোমরা কি এ ব্যাপারে বিতর্ক করবে?"

এখানে তিনি যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে দেখালেন যে, নবুওয়াত কোনো ব্যক্তিগত দাবি নয়; এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত স্পষ্ট নিদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি তাদের চ্যালেঞ্জ করলেন, যদি তাঁর কথা মিথ্যা হয়, তারা যেন প্রমাণ উপস্থাপন করে কিন্তু তারা তা পারেনি। এভাবে তিনি তর্ক-বিতর্ককে শান্তভাবে, যুক্তিনির্ভর আলোচনায় রূপান্তর করেন।[234]

এই তিনটি দাওয়াতি গুণ একত্রে হযরত হুদ (আঃ)-এর দাওয়াতকে এক অনন্য আদর্শে রূপ দিয়েছিল।

---

[230] সূরা হুদ: ৫০

[231] তাফসির ইবন কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া

[232] সূরা হুদ: ৫২

[233] কাসাসুল আম্বিয়া, ইবনে কাসীর

[234] তাফসির ইবন কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া

বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বোঝানো

দাওয়াতের অর্থ হলো মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, তাকে ঈমান, সৎ কাজ, নৈতিকতা ও আল্লাহভীতির পথে পরিচালিত করা।

"বাস্তব উদাহরণ দিয়ে দাওয়াত" বলতে বোঝায় - শুধু মুখে কথা বলে নয়, বাস্তব জীবনের ঘটনা, দৃষ্টান্ত ও কর্মের মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া।

অর্থাৎ, নবীগণ যখন দাওয়াত দিতেন, তাঁরা মানুষের জীবনের ঘটনার সাথে আল্লাহর নির্দেশ ও সত্যের সম্পর্ক দেখিয়ে বুঝাতেন। এতে মানুষ শুধু তত্ত্ব নয়, বাস্তবতার আলোকে সত্যকে অনুভব করতে পারত। [235]

হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে প্রায় ৯৫০ বছর ধরে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন। তিনি শুধু মুখে কথা বলেননি, বরং নিজের কাজের মাধ্যমে দাওয়াতের বাস্তব উদাহরণ স্থাপন করেছেন। যখন আল্লাহ তাঁকে নৌকা বানাতে আদেশ দেন, তখন তিনি মরুভূমিতে নৌকা নির্মাণ শুরু করেন, যা দেখতে মানুষের কাছে অদ্ভুত লাগত। তারা তাঁকে উপহাস করত, হাসাহাসি করত। তখন নূহ (আঃ) বলেছিলেনঃ "তোমরা যদি আজ আমাকে উপহাস করো, একদিন তোমরাও উপহাসের পাত্র হবে।"

নূহ (আঃ)-এর এই কাজ আসলে একটি জীবন্ত শিক্ষা ছিল - তিনি নৌকা বানিয়ে মানুষকে দেখাতে চেয়েছিলেন যে, আল্লাহর আজাব সত্য এবং তাঁর আদেশ অবহেলা করলে পরিণতি ভয়াবহ হবে। তিনি কেবল কথায় নয়, কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর বার্তা মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন। এইভাবে তাঁর দাওয়াত বাস্তব ও কার্যকর হয়ে ওঠে। [236]

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জাতিকে মূর্তিপূজার ভুল ও অযৌক্তিকতা বোঝাতে যুক্তি ও বাস্তব উদাহরণ ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর জাতি সূর্য, চাঁদ, তারা ও বিভিন্ন প্রতিমাকে উপাস্য মনে করত। তিনি মানুষের সামনে একে একে এসব জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেনঃ "যখন রাত তাঁকে আচ্ছন্ন করল, তখন তিনি এক তারকা দেখলেন; বললেন, 'এটাই কি আমার রব?' পরে যখন তা অস্ত গেল, বললেন, 'আমি ভালোবাসি না তাদের, যারা অস্ত যায়।'"

ইব্রাহীম (আঃ) মানুষের বুদ্ধি ও চোখে দেখা বাস্তব জিনিস ব্যবহার করে সত্য বোঝাতেন। তিনি দেখালেন, যেসব জিনিস ওঠে ও অস্ত যায়, তারা নিজেরাই টিকে থাকতে পারে না, তাই তারা কারো রব (প্রভু) হতে পারে না।

এইভাবে তিনি যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করলেন যে, সৃষ্ট জিনিস নয়, বরং যিনি সবকিছুর স্রষ্টা তিনিই উপাস্য। ইব্রাহীম (আঃ) শুধু কথায় নয়, দৃশ্যমান উদাহরণ দিয়ে মানুষকে চিন্তা করতে শিখিয়েছিলেন। তাঁর এই দাওয়াত ছিল জ্ঞানের, পর্যবেক্ষণের ও চিন্তাশক্তির দাওয়াত। [237]

হযরত ঈসা (আঃ) মানুষের হৃদয় ও বুদ্ধিকে আল্লাহর একত্বের প্রতি আকৃষ্ট করতে দাওয়াত দিতেন। তিনি শুধু কথায় নয়, বাস্তব নিদর্শন ও কর্মের মাধ্যমে দাওয়াত প্রচার করতেন।

---

[235] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া - ইবনে কাসীর

[236] তাফসির ইবন কাসীর, খণ্ড ২, সূরা হুদ – ৩৮; কাসাসুল আম্বিয়া — ইবনে কাসীর

[237] তাফসির ইবন কাসীর, সূরা আল-আনআম ৭৬–৭৯; কাসাসুল আম্বিয়া - ইবনে কাসীর

وَرَفَعَ إِلَيْهِمْ آيَاتٍ فِي الْأُخْرَى

"আমি জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেই এবং মৃতকে জীবিত করি আল্লাহর অনুমতিতে।" [238]

ঈসা (আঃ) রোগী সুস্থ করা, মৃতকে জীবিত করা এবং অন্যান্য অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়েছিলেন। এই কাজগুলো মানুষকে প্রমাণ করত যে তিনি আল্লাহর রাসূল। তাঁর ক্ষমতা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কিছুই নয়, তাই মানুষ বুঝতে পারত যে সত্যিকার শক্তি আল্লাহর।

ঈসা (আঃ)-এর কর্মশৈলী দেখিয়েছিল যে দাওয়াত শুধুই কথার মাধ্যমে নয়, বাস্তব উদাহরণ ও প্রমাণ দিয়ে আরও শক্তিশালী হয়। [239]

নবী মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর পাঠানো সর্বশেষ রাসূল। তিনি মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন শুধু কথায় নয়, বরং নিজের আচার-আচরণ, নৈতিকতা ও সহনশীলতার মাধ্যমে। তাঁর দাওয়াতের মূল শক্তি ছিল তাঁর চরিত্র। তিনি কখনো রূঢ় ভাষা ব্যবহার করেননি, প্রতিপক্ষকে অপমান করেননি, বরং ধৈর্য, দয়া ও নরম আচরণের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করেছেন। মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন,"তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র উত্তম।" [240]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষকে ইসলাম শেখাতে নিজের জীবনের বাস্তব উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন -

- সততা কেমন হওয়া উচিত (যার জন্য তাঁকে "আল-আমিন" বলা হতো)।
- কষ্টের সময়েও ধৈর্য ধরতে হয়।
- শত্রুর প্রতিও ন্যায় ও দয়া প্রদর্শন করতে হয়।

এইভাবে নবী ﷺ-এর চরিত্রই হয়ে উঠেছিল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াত। মক্কার মানুষ ইসলামের সত্যতা শুধু তাঁর কথায় নয়, বরং তাঁর জীবন দেখেই বুঝেছিল। তাঁর প্রতিটি কাজই মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করত। [241]

[238] সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৪৯

[239] তাফসির ইবন কাসীর, সূরা আলে ইমরান ব্যাখ্যা

[240] সহিহ বুখারী: হাদিস ৬০২৯

[241] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৩ - ইবনে কাসীর

কঠিন পরিস্থিতিতেও দৃঢ়তা

বাস্তব কঠিন পরিস্থিতিতে দৃঢ়তা বলতে বোঝায় - আল্লাহর পথে দাওয়াহ বা সৎ কাজ চালিয়ে যাওয়া - যখন বিপদ, প্রতিকূলতা, লোকের বিদ্রূপ বা ধ্বংসের হুমকি থাকে।

- অবিচল বিশ্বাস - দাওয়াত বা ইসলামের বার্তায় বিশ্বাস হারানো নেই।
- ধৈর্য ও স্থিতিশীলতা - কঠিন পরিস্থিতিতে শান্ত ও দৃঢ় থাকা।
- নৈতিক দৃঢ়তা - কখনো অপসংস্কার, মিথ্যা বা জোরপূর্বক দাওয়াত নয়।

যদি নবীরা কোনো বিপজ্জনক জাতি বা অত্যাচারী শাসকের মুখোমুখি হন, তবুও আল্লাহর পথে আহ্বান চালিয়ে যাওয়া, এটিই দৃঢ়তার প্রকৃত চিহ্ন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তারকাপূজা ও মূর্তিপূজার সমাজে দাওয়াহ দিচ্ছিলেন। তাঁকে হত্যা বা সমাজের দ্বারা নিপীড়নের হুমকি ছিল। তিনি যুক্তি ও প্রজ্ঞা ব্যবহার করে আল্লাহর একত্ব বোঝাতেন। সমাজের বিদ্রূপ বা হুমকি উপেক্ষা করে সত্য প্রকাশ করতেন। যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে দাওয়াহ অব্যাহত রাখতেন।

ইব্রাহীম (আঃ)-এর এই দাওয়াহ দেখায়, যে বাস্তব বিপদ বা হুমকির মুখেও আল্লাহর পথে অবিচল থাকা এবং যুক্তি-ভিত্তিক আহ্বান চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে দৃঢ়তার মূল চিহ্ন। [242]

হযরত নূহ (আঃ) কে তাঁর জাতি অবিশ্বাসী ও বিদ্রূপকারী; তিনি ৯৫০ বছর মানুষকে দাওয়াহ দিয়েছেন। তিনি ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে বারবার আহ্বান করেছেন। তিনি দীর্ঘ সময় নিরলস দাওয়াত দিয়েছেন। বিদ্রূপ ও অবহেলাকে উপেক্ষা করেছেন। [243]

মক্কার মুশরিকরা নবী ﷺ-এর প্রতি বিদ্রূপ করত, হুমকি দিত এবং শারীরিক নির্যাতনেরও চেষ্টা করত। তিনি মানুষের বিদ্রূপ ও হুমকি উপেক্ষা করে দাওয়াহ অব্যাহত রাখতেন। সদাচার, নম্রতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে দাওয়াহ প্রদান করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াহ প্রমাণ করে যে নম্রতা ও প্রজ্ঞা কেবল ব্যক্তি নৈতিকতার অংশ নয়, বরং কঠিন পরিস্থিতিতেও দাওয়াহ চালিয়ে যাওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। [244]

---

[242] কাসাসুল আম্বিয়া, ইবনে কাসীর

[243] কাসাসুল আম্বিয়া, ইবনে কাসীর

[244] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া

শিষ্টাচার, দয়া ও সহমর্মিতা

শিষ্টাচার

শিষ্টাচার বলতে বোঝায় মানুষের সাথে বিনয় ও সৌজন্যের সঙ্গে আচরণ করা, আক্রমণাত্মক ভাষা বা কঠোরতা পরিহার করা। দাওয়াতের ক্ষেত্রে শিষ্টাচার মানে হলো - আহ্বান এমনভাবে করা, যাতে অন্যের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সে অনুভব করে যে তাকে অবমাননা নয়, বরং সম্মানিতভাবে সত্যের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে।

দয়া

দয়া হলো অপরের প্রতি কোমল ও সহানুভূতিশীল মনোভাব পোষণ করা। একজন দাওয়াতকারী যদি দয়ার হৃদয় ধারণ না করেন, তবে তার কথা হৃদয়ে পৌঁছায় না। ভুল-ত্রুটি ধরার ক্ষেত্রে তিরস্কারের বদলে কোমলভাবে, ‘‘সঠিক পথে আলতোভাবে ফিরিয়ে আনা’’- এই পদ্ধতিই প্রকৃত দয়া-নির্ভর দাওয়াত।

সহমর্মিতা

সহমর্মিতা মানে অন্যের অবস্থান ও মানসিকতা বুঝে তার অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল থাকা। দাওয়াতে সহমর্মিতা বলতে বোঝায় - আহ্বানকারী যেন মানুষের চিন্তা-ভাবনা, সমস্যা ও ব্যথা অনুধাবন করে এমনভাবে কথা বলে, যাতে তারা মনে করে -‘‘এই মানুষটি আমাকে বোঝে।’’

এই তিনটি গুণ - শিষ্টাচার, দয়া ও সহমর্মিতা একত্রে মিলিত হলে দাওয়াতের প্রভাব গভীর হয়। মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসা, আস্থা ও শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়, ফলে দাওয়াত গ্রহণের সম্ভাবনা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

সমস্ত নবী-রাসূল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানবজাতিকে সত্য ও তাওহীদের পথে আহ্বান করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তাঁদের দাওয়াত ছিল আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত। তবে তাঁদের আহ্বান শুধুমাত্র নির্দেশ, হুঁশিয়ারি বা উপদেশমূলক কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা ছিল একটি জীবন্ত আদর্শ, যেখানে শিষ্টাচার, দয়া এবং সহমর্মিতা - এই গুণগুলো একসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে।

নবীগণ জানতেন, মানুষের অন্তর জয় করা সম্ভব নয় রূঢ় ভাষা, ভয় দেখানো বা কড়া আচরণের মাধ্যমে; বরং কোমল আচরণ, ভালোবাসা ও মানবিক সহানুভূতির মাধ্যমে সত্যের প্রতি আকৃষ্ট করা সম্ভব। তাই তাঁরা দাওয়াতের প্রতিটি ধাপে বিনয় ও নম্রতা বজায় রেখেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ তাআলা মূসা ও হারুন (আঃ)-কে যখন ফেরাউনের মতো এক কঠোর শাসকের কাছে পাঠালেন, তখনও তাঁদের নির্দেশ দিলেন -

"فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ"

অর্থ: “তোমরা ফেরাউনের সঙ্গে কোমলভাবে কথা বল, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে বা ভয় করবে।” [245]

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দাওয়াতের মূলনীতি সব নবীর জন্যই একই ছিল - শিষ্টাচারপূর্ণ, দয়াশীল ও সহমর্মিতাপূর্ণ আহ্বান।

নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনেও এই গুণগুলো সর্বোচ্চ পরিমাণে দেখা যায়। তিনি শত্রুদের প্রতিও দয়া করেছেন, মূর্খদের সহ্য করেছেন এবং সর্বদা কোমলভাবে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর জীবন ছিল ‘কুরআনের বাস্তব রূপ’।

ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতা ও জাতিকে দাওয়াত দিয়েছিলেন শিষ্টাচার ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায়।

يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ

“হে আমার পিতা! আপনি শয়তানকে উপাসনা করবেন না।” [246]

এখানে “يَا أَبَتِ” (হে আমার প্রিয় পিতা) - এই সম্বোধনটিই শিষ্টাচার ও কোমলতার প্রতীক। তিনি কটুবাক্য বলেননি, বরং বিনয়ের সাথে যুক্তি ও দয়া দ্বারা দাওয়াত দিয়েছেন। [247]

নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাওয়াত ছিল তিন গুণের পরিপূর্ণ প্রতিফলন।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন -

وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

“যদি তুমি কঠোর ও কড়া হৃদয়ের হতে, তবে তারা তোমার চারপাশ থেকে সরে যেত।” [248]

তিনি কখনো কারো প্রতি রুক্ষ হননি, বরং দয়া, শিষ্টাচার ও সহমর্মিতা দিয়ে দাওয়াত করেছেন। যেমন তায়েফবাসীরা তাঁকে রক্তাক্ত করলেও তিনি দো‘আ করেছিলেন:

“اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ”

“হে আল্লাহ! আমার জাতিকে হিদায়াত দিন, কারণ তারা জানে না।” [249]

[245] সূরা ত্বাহা ২০:৪৪

[246] সূরা মরিয়ম ১৯ : ৪৪

[247] তাফসির কুরতুবি; কাসাসুল আম্বিয়া, অধ্যায়—ইবরাহীম (আঃ)

[248] সূরা আলে ইমরান ৩ : ১৫৯

[249] সহীহ বুখারী, হাদীস ৩২৩১; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫/১০৩

নবীদের দাওয়াতের চ্যালেঞ্জ

অবিশ্বাসীদের বিরোধিতা

আল্লাহ তাআলা ইতিহাসের প্রতিটি যুগে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। কিন্তু প্রায় সব নবীই তাদের জাতির অবিশ্বাসীদের তীব্র বিরোধিতা ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন। অবিশ্বাসীরা নবীদের দাওয়াতকে নিজেদের ক্ষমতা, অহংকার ও স্বার্থের বিরুদ্ধে মনে করে বিরোধিতা করত। কেউ নবীদেরকে মিথ্যাবাদী বলত, কেউ যাদুকর বা পাগল বলত। তারা উপহাস করত, মিথ্যা অভিযোগ তুলত এবং নানা কষ্ট দিত। তবুও নবীগণ আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী দাওয়াত চালিয়ে গেছেন ধৈর্য, সহনশীলতা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে। তারা কখনও দাওয়াতের কাজ থেকে পিছু হটেননি, বরং আল্লাহর উপর ভরসা করে মানুষের হিদায়াতের জন্য কাজ করেছেন।

হযরত নূহ (আঃ) ছিলেন মানবজাতিকে ঈমান ও তাওহীদ প্রথায় আহ্বান করার জন্য আল্লাহর প্রেরিত নবী, যিনি প্রায় ৯৫০ বছর দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁর জীবন ও দাওয়াতের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে নবীদের কার্যক্রম প্রায়শই অবশ্যই বিরোধিতা ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়। নূহ (আঃ)-এর ক্ষেত্রে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

নূহ (আঃ)-এর জাতি তাঁকে বিভিন্নভাবে বিরোধিতা করেছে। তারা তাঁকে পাগল বা মিথ্যাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। তাদের কৌশলগুলো ছিল:

- উপহাস ও সামাজিক চাপ: নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতকে হাস্যকর ও অপ্রয়োজনীয় হিসেবে উপস্থাপন করা।
- মিথ্যা অভিযোগ: তাঁকে আল্লাহর নিন্দক বা প্রতারণাকারী হিসেবে প্রদর্শন।
- নির্যাতন ও চাপ: সামাজিক বঞ্চনা, উপেক্ষা এবং প্রয়োজনে ভয়ঙ্কর হুমকি ও শারীরিক কষ্ট।

এই প্রতিক্রিয়াগুলো নূহ (আঃ)-এর জন্য একধরনের মানসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করেছিল।

নূহ (আঃ) কখনও প্রতিকূলতা বা বিরোধের সম্মুখীন হয়ে দাওয়াত থেকে সরে আসেননি। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে সতর্কবার্তা প্রদান চালিয়েছেন, যা প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও স্থিরতার প্রমাণ। তাঁর দাওয়াতের সকল ধাপ আল্লাহর নির্দেশ ও সহায়তার ওপর নির্ভরশীল ছিল। তিনি জানতেন যে মানুষের প্রতিক্রিয়া তাঁর কাজকে সীমাবদ্ধ করতে পারবে না, কারণ সত্য ও ন্যায় আল্লাহর হাতে রয়েছে।

নূহ (আঃ) কেবল বলতেন ‘‘আপনারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন’’- কোনো ধরনের হিংস্র প্রতিশোধ নয়, বরং ধৈর্য ও যুক্তি প্রয়োগ করেই দাওয়াত প্রচার করতেন।

চূড়ান্তভাবে, যখন অবিশ্বাসীরা দাওয়াত উপেক্ষা ও উপহাসের সীমা অতিক্রম করে, তখন আল্লাহ অবিশ্বাসীদের উপর মহাপ্লাবন প্রেরণ করে তাদের ধ্বংস করেন। এই ঘটনাটি দাওয়াতের ধারাবাহিকতা, নবীর ধৈর্য, এবং আল্লাহর সাহায্যের কার্যকারিতা সবকিছুই তুলে ধরে।[250]

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জাতিকে মূর্তিপূজা ও অহংকারমুখী আচরণ থেকে বিরত করার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁর জীবনীতে আমরা দেখতে পাই যে দাওয়াতের পথে তিনি প্রচণ্ড বিরোধিতা, সামাজিক চাপ এবং শারীরিক হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন। ইব্রাহীম (আঃ)-এর জাতি তাঁর দাওয়াতকে বিপজ্জনক ও বিপথগামী মনে করেছিল। তারা নিম্নলিখিত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে:

- অহংকার ও ক্ষমতার জোড়: তারা তাদের মূর্তিপূজার চলমান প্রথাকে রক্ষা করতে চেয়েছিল।

[250] কাসাসুল আম্বিয়া – ইবন কাসির, অধ্যায়: কিসসাতু নূহ আলাইহিস সালাম

- উপহাস ও নিন্দা: নবীকে মিথ্যাবাদী, পাগল বা অদ্ভুত ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করত।
- নির্যাতন ও হত্যার চেষ্টা: অবশেষে তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করার পরিকল্পনা করা হয়। ‘‘তারা বলল, একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।’’

ইব্রাহীম (আঃ) এই বিরোধিতার মুখোমুখি হলেও দাওয়াত থেকে সরে আসেননি। ইব্রাহীম (আঃ) সরল ও প্রাঞ্জল যুক্তির মাধ্যমে জাতিকে বোঝাতেন, ‘‘তোমাদের উপাস্য কোনো সত্তা নয়, তারা তোমাদের সাহায্য করতে পারে না। সত্যের দাওয়াত গ্রহণ কর।’’

বিপরীত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে তিনি কখনও হতাশ হননি। বরং দৃঢ় মনোবল বজায় রেখে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলেছেন। ইব্রাহীম (আঃ)-এর দাওয়াতের প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহর সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করলেও আল্লাহ আগুনকে শান্ত ও নিরাপদ করেছিলেন। [251]

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন শেষ নবী ও রাসূল, যিনি আল্লাহর দাওয়াত সর্বজনীনভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রেরিত। তাঁর দাওয়াতের পথও প্রায়শই তীব্র বিরোধিতা, সামাজিক চাপ এবং শারীরিক হুমকির মুখোমুখি হয়েছে। কুরাইশরা নবীর দাওয়াতকে গ্রহণ করতে চায়নি। তারা নবী ﷺ-কে বিভিন্নভাবে দোষারোপ করত:

- মিথ্যাবাদী ও বিভ্রান্তিকর বলা: নবীকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেওয়া হতো।
- যাদুকর বা জাদুকর বলা: তারা দাবি করত নবী ﷺ অলৌকিক বা জাদুকর দ্বারা মানুষকে প্রভাবিত করছেন।
- উপহাস ও সামাজিক চাপ: নবী ﷺ-কে অবহেলা, অবজ্ঞা এবং সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা হতো।

নবী ﷺ এই বিরোধিতার মুখোমুখি হলেও দাওয়াত থেকে কখনও সরে আসেননি। তিনি দৃঢ় মনোবল, ধৈর্য এবং প্রজ্ঞার (হিকমাহ) মাধ্যমে দাওয়াত চালিয়েছেন। [252]

---

[251] বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবন কাসির, খণ্ড ১, অধ্যায়: কিসসাতু ইব্রাহীম

[252] সিরাতুন নবী – ইবন হিশাম, খণ্ড ১

মিথ্যা অভিযোগ, উপহাস ও নির্যাতন

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে ফেরানোর জন্য প্রেরণ করেছেন নবী ও রাসূলগণকে। তাঁদের কাজ ছিল আল্লাহর বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, মানুষকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করা, শিরক ও অন্যায় থেকে বিরত রাখা। কিন্তু এই দাওয়াতের পথ কখনও সহজ ছিল না। প্রতিটি নবীর জীবন ছিল এক কঠিন সংগ্রামের ইতিহাস, এক ধৈর্যের কাব্য।

মানুষ সাধারণত যে সত্যকে তাদের ইচ্ছার বিপরীতে পায়, তাকে অস্বীকার করে বসে। ঠিক তেমনি, নবীদের দাওয়াতও মানুষের অহংকার ও কুসংস্কারের দেয়ালে আঘাত হেনেছিল। ফলে তারা নবীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, উপহাস করে, এবং বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ তোলে। কেউ বলেছে, ‘‘এরা পাগল’’, কেউ বলেছে, ‘‘যাদুকর’’, আবার কেউ বলেছে, ‘‘মিথ্যাবাদী’’

তাদের এই বিদ্রূপ, কটূক্তি ও নির্যাতনের মধ্য দিয়েও নবীগণ কখনও হতাশ হননি। কারণ তাঁরা জানতেন আল্লাহর সন্তুষ্টিই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তারা মানুষকে আল্লাহর দাসত্বের পথে ডাকতেন, যেখানে কোনো স্বার্থ ছিল না, কোনো প্রতিদান চাওয়া ছিল না। তবুও মানুষ তাঁদের প্রতি উপহাস করত, অপবাদ দিত, এমনকি প্রিয়জনদের সামনে নির্যাতন করত। কেউ আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, কেউ নিজ জাতির হাতে নির্বাসিত হয়েছেন, কেউ নিজের শহর থেকে বিতাড়িত হয়েছে।

হযরত নূহ (আঃ) দীর্ঘ ৯৫০ বছর তাঁর জাতিকে আল্লাহর পথে ডেকেছিলেন। কিন্তু তাঁর জাতি তাঁর দাওয়াতকে গ্রহণ না করে তাঁকে ‘‘পাগল’’ বলে উপহাস করত। যখন তিনি আল্লাহর আদেশে নৌকা বানাতে শুরু করলেন, তখনও তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। লোকেরা তাঁকে বলত, ‘‘ওহে নূহ! পাহাড়ের উপর নৌকা বানাচ্ছ! এখন কি পানির বদলে পাথরেই চলবে?’’

তবুও নূহ (আঃ) ধৈর্য ধরে বলতেন, ‘‘তোমরা আজ আমাকে উপহাস করছ, একদিন আমিও তোমাদের উপহাস দেখব যখন আল্লাহর শাস্তি আসবে।’’ [253]

ইবরাহীম (আঃ) তাঁর জাতিকে মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন। তিনি যুক্তি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে বলেছিলেন, ‘‘যে মূর্তি কথা বলতে পারে না, তোমাদের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না তাকে কেন উপাসনা করছ?’’ কিন্তু তাঁর জাতি তাঁকে ‘‘বিদ্রোহী’’ বলে ঘোষণা করে এবং মৃত্যুদণ্ড দিতে চায়। ‘‘তারা বলল, ওকে আগুনে নিক্ষেপ করো এবং তোমাদের দেবতাদের সাহায্য করো, যদি কিছু করতে পারো।’’

তাঁকে একটি বিশাল আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, কিন্তু আল্লাহর হুকুমে আগুন ঠান্ডা হয়ে যায়। [254]

মূসা (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে ফেরাউনের সামনে গিয়ে বলেছিলেন, ‘‘আল্লাহর বান্দাদের মুক্ত করে দাও।’’ কিন্তু ফেরাউন তাঁকে ‘‘যাদুকর’’, ‘‘মিথ্যাবাদী’’ এবং ‘‘বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী’’ বলে অপবাদ দিল।

‘‘ফেরাউন বলল, এই লোকটি তো এক চতুর যাদুকর, সে তোমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়।’’ [255]

---

[253] তাফসির ইবনে কাসির- সূরা হূদ 11:38

[254] বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ইবনে কাসির); সূরা আনবিয়া 21:68

[255] সূরা শু‘আরা 26:34–35

মূসা (আঃ)-এর দাওয়াত শুনে ফেরাউন তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনাও করেছিল। কিন্তু মূসা (আঃ) আল্লাহর উপর ভরসা রেখে বলেছিলেন, ‘‘আমার রব আমার সাথে আছেন, তিনি অবশ্যই আমাকে পথ দেখাবেন।’’ [256]

মক্কার কুরাইশরা যখন দেখল যে মুহাম্মদ ﷺ মানুষকে আল্লাহর একত্বে আহ্বান করছেন, তখন তারা তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপবাদ দিতে শুরু করল। কেউ বলল তিনি ‘‘যাদুকর’’, কেউ বলল ‘‘কবি’’, কেউ বলল ‘‘মিথ্যাবাদী’’

‘‘তারা বলে, এই কুরআন তো এক জাদু, যা সে নিজেই বানিয়েছে।’’ [257]

তাঁর প্রতি উপহাস ও নির্যাতন ছিল অকল্পনীয়।

একদিন নবী ﷺ যখন কা‘বা শরীফে সিজদায় ছিলেন, তখন উকবা ইবনে আবি মুইত তাঁর পিঠে উটের নাড়িভুঁড়ি ফেলে দেয়। [258]

তবুও নবী ﷺ ধৈর্য ধরেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করেন,

‘‘হে আল্লাহ! তুমি আমার জাতিকে হিদায়াত দাও, কারণ তারা জানে না।’’ [259]

---

[256] কাসাসুল আম্বিয়া

[257] সূরা আস-সাফফাত 37:15

[258] সিরাতুন নবী (ইবনে হিশাম) ও বিদায়া ওয়ান নিহায়া

[259] সহীহ বুখারী, হাদীস ২৯৩১

সাময়িক ব্যর্থতা ও হতাশা

নবীদের জীবন কখনোই সহজ ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে পাঠিয়েছেন মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের জন্য, আর এই কাজটি ছিল সবচেয়ে কঠিন দায়িত্ব। তাঁরা যে জাতির কাছে দাওয়াত দিয়েছেন, সেই জাতিই অনেক সময় তাঁদের বিরোধিতা করেছে, উপহাস করেছে, এমনকি নির্যাতন করেছে। তবুও নবীগণ ধৈর্য, তাওয়াক্কুল ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে দাওয়াতের পথে অবিচল থেকেছেন।

হযরত নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর দাওয়াত দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর জাতির অল্প সংখ্যক মানুষই ঈমান এনেছিল। প্রতিবার তিনি যখন মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতেন, তারা কানে আঙুল দিত, কাপড় দিয়ে নিজেদের ঢেকে নিত, এবং অহংকারের সঙ্গে তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করত।এই দীর্ঘ সময়ে তিনি দিন-রাত, গোপনে ও প্রকাশ্যে মানুষকে বলেছিলে, "তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর কাছে তাওবা করো, তাহলে তোমরা মুক্তি পাবে।" কিন্তু তাঁর জাতি তাঁকে নিয়ে উপহাস করত, তাঁকে "পাগল" বলত, এমনকি যখনই তিনি কথা বলতে চাইতেন, তারা নিজেদের কানে আঙুল দিত, কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিত যেন তাঁর কথা শুনতে না হয়। তাঁদের এই অহংকার, বিদ্রূপ ও অবহেলায় এক সময় নূহ (আঃ)-এর হৃদয়ে গভীর দুঃখ জন্ম নেয়।

তিনি কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর কাছে বলেন,

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا

"হে আমার প্রভু! আমি দিন-রাত আমার জাতিকে আহ্বান করেছি, কিন্তু আমার আহ্বান তাদেরকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে।" [260]

এই বাক্যে নূহ (আঃ)-এর হতাশার সুর স্পষ্ট। একজন নবী হিসেবে তিনি নিজের দায়িত্ব থেকে পিছু হটেননি, কিন্তু জাতির একগুঁয়েমি তাঁকে মানসিকভাবে ভারাক্রান্ত করেছিল। বহু বছর ধরে তাঁর দাওয়াত শুনে মানুষ যখন মুখ ফিরিয়ে নিল, তখন তিনি অনুভব করলেন, "এরা আর ফিরবে না।"

তিনি আরও বলেন,

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا

"হে আমার প্রভু! তুমি পৃথিবীতে অবিশ্বাসীদের মধ্যে কাউকেই জীবিত রেখো না।" [261]

এই দো'আ তাঁর দাওয়াতের ব্যর্থতার বেদনা ও গভীর হতাশা প্রকাশ করে। একজন নবী হিসেবে যিনি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন দেখলেন কেউ পরিবর্তন হচ্ছে না, তখন তাঁর অন্তর ভেঙে পড়েছিল।

[260] সূরা নূহ, আয়াত ৫–৬

[261]সূরা নূহ, আয়াত ২৬

এই হতাশা ছিল সাময়িক। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁকে দৃঢ়ভাবে আশ্বস্ত করলেন যে, তাঁর ধৈর্যের ফল ব্যর্থ হবে না। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন নৌকা তৈরির, আর সেই নৌকার মাধ্যমেই তিনি ও ঈমানদারগণ রক্ষা পেলেন, আর অবিশ্বাসীরা ধ্বংস হল। [262]

হযরত ইবরাহিম (আঃ) ছিলেন এক দৃঢ়চিত্ত নবী, যিনি ছোটবেলা থেকেই সত্যকে চিনতে পেরেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন তাঁর পিতা ও জাতি পাথরের মূর্তি বানিয়ে তাদের পূজা করছে। তাঁর অন্তর থেকে প্রশ্ন উঠেছিল, "যে মূর্তি কথা বলে না, শুনতে পায় না, কিছুই করতে পারে না সে কীভাবে উপাস্য হতে পারে?" এই প্রশ্নই ছিল তাঁর দাওয়াতের সূচনা। তিনি নরম ভাষায়, যুক্তি দিয়ে পিতাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর পিতা আজার রাগে ফেটে পড়লেন। তিনি বললেন, "তুমি যদি আমার দেবতাদের থেকে ফিরে না আসো, আমি তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব!"

এই কঠিন মুহূর্তে ইবরাহিম (আঃ)-এর মনে কষ্ট এসেছিল। নিজের পিতা, নিজের জাতি যাদের তিনি সত্যের পথে আনতে চেয়েছিলেন, তারাই শত্রুতে পরিণত হল। এরপর তিনি একা হয়ে পড়লেন। পিতা, জাতি, সমাজ কেউ পাশে রইল না। এই নিঃসঙ্গতাই ছিল তাঁর জন্য দাওয়াতের সবচেয়ে বড় মানসিক চ্যালেঞ্জ।

তিনি তাঁর জাতির মূর্তি ভেঙে প্রমাণ করলেন, এরা কিছুই করতে পারে না। কিন্তু সেই যুক্তির প্রতিদান হিসেবে তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নিল তারাই যাদের তিনি মুক্তির পথে আহ্বান করেছিলেন।

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ

"তারা বলল, ওকে জ্বালিয়ে দাও এবং তোমাদের দেবতাদের সাহায্য করো, যদি কিছু করতে চাও।" [263]

অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, মানুষ হাসছে, "এবার দেখা যাক তোমার আল্লাহ তোমাকে বাঁচাতে পারে কি না!" সেই মুহূর্তে ইবরাহিম (আঃ)-এর অন্তরে মানবিক এক ব্যথা, একাকীত্ব, এবং একরকম সাময়িক হতাশা জাগে। কারণ তিনি তো দাওয়াত দিয়েছিলেন কল্যাণের জন্য, অথচ প্রতিদান পেলেন আগুনের হুমকি।

কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন,

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক।" [264]

এবং তখনই আল্লাহ তাআলা আগুনকে আদেশ দিলেন,

---

[262] তাফসির ইবন কাসির, সূরা নূহ ব্যাখ্যা অংশ;কাসাসুল আম্বিয়া, ইবন কাসির, অধ্যায় "নূহ (আঃ)-এর কাহিনী";আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবন কাসির, খণ্ড ১

[263] সূরা আল-আনবিয়া, আয়াত ৬৮

[264] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৫৬৩

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

"হে আগুন! তুমি ঠান্ডা ও নিরাপদ হয়ে যাও ইবরাহিমের জন্য।" [265]

এই অলৌকিক মুহূর্তে ইবরাহিম (আঃ)-এর হতাশা দূর হয়ে যায়, তাঁর ঈমান আরও অটল হয়ে ওঠে। আগুন তাঁর জন্য বাগানে পরিণত হয়। [266]

এই ঘটনাটি আমাদের শেখায় নবীরা মানুষই ছিলেন, তাঁদেরও হৃদয় ব্যথিত হয়েছে, একাকীত্বে চোখ ভিজেছে, এবং কখনও কখনও মনে হয়েছে, মানুষ আর সাড়া দেবে না। কিন্তু তাঁদের পার্থক্য ছিল তাওয়াক্কুলে, তারা কখনও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হননি। তাঁদের সাময়িক হতাশা পরিণত হয়েছে অটল ঈমান ও দৃঢ় সংকল্পে। বিপদের মুখে তাঁরা আরও শক্ত হয়েছেন, আরও ধৈর্যশীল হয়েছেন।

অবশেষে আল্লাহ তাঁদের বিজয় দান করেছেন আগুনকে করেছেন শীতল, সমুদ্রকে করেছেন রাস্তা, আর বিদ্রূপকারীদের পরিণত করেছেন নিদর্শনে। নবীদের এই ধৈর্য ও দৃঢ়তা আজও দাওয়াতের কর্মীদের জন্য এক অনন্ত অনুপ্রেরণা - যাতে হতাশার অন্ধকারে তারা আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারে এবং দাওয়াতের মিশন থেকে কখনও ফিরে না যায়। [267]

---

265 সূরা আল-আনবিয়া, আয়াত ৬

266 আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবন কাসির, খণ্ড ১, অধ্যায় "কাহিনী ইবরাহিম (আঃ)"

267 কাসাসুল আম্বিয়া, তাফসির ইবন কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, সীরাত ইবন হিশাম

আল্লাহর সাহায্য ও চূড়ান্ত সাফল্য

নবীদের জীবন ছিল চ্যালেঞ্জে পূর্ণ। দীর্ঘ সময়ের দাওয়াত, মানুষের অবিশ্বাস, উপহাস ও নির্যাতন সবকিছু তাদেরকে সাময়িকভাবে হতাশ করেছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁদের ধৈর্য ও নিষ্ঠাকে দেখে অসীম সাহায্য ও বিজয় প্রদান করেছেন।

হযরত নূহ (আঃ) প্রায় এক হাজার বছর ধরে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর জাতির কেবল অল্প সংখ্যক মানুষই ঈমান এনেছিল। প্রত্যেকবার তিনি দাওয়াত দিতেন, মানুষ তাঁকে অবহেলা করত, বিদ্রূপ করত এবং তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করত। এই পরিস্থিতিতে নূহ (আঃ)-এর হৃদয়ে হতাশা ও ব্যর্থতার অনুভূতি জন্ম নিত।

তবুও তিনি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা রেখেছিলেন এবং দো'আ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নির্দেশ দিলেন নৌকা তৈরির জন্য। নবী (আঃ) সেই আদেশ মেনে নৌকা তৈরি করলেন। নৌকায় তিনি ও ঈমানদাররা নিরাপদভাবে রক্ষা পেলেন, আর যারা অবিশ্বাসী ছিলেন তারা প্লাবনের পানিতে ধ্বংস হল।

এই ঘটনার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই, নবীর ধৈর্য, কঠোর পরিশ্রম ও আল্লাহর সাহায্যের মাধ্যমে সাময়িক ব্যর্থতা পরিণত হয় চূড়ান্ত সাফল্যে। [268]

হযরত ইবরাহিম (আঃ) যখন তাঁর জাতির প্রতি দাওয়াত দিচ্ছিলেন, তখন তাঁকে কঠোর প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়। অবিশ্বাসীরা তাঁকে উপহাস করত, ক্রোধ প্রকাশ করত এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই মুহূর্তে ইবরাহিম (আঃ)-এর অন্তরে কিছুটা হতাশার ছায়া নেমে আসে। কারণ তিনি শুধুই মানুষের কল্যাণের জন্য আহ্বান দিচ্ছিলেন, কিন্তু তার প্রতিদান পেলেন হুমকি ও অবজ্ঞা।

তবুও তাঁর ঈমান অটল ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর ধৈর্য ও বিশ্বাসের স্বীকৃতিস্বরূপ আগুনকে আদেশ দিলেন, যাতে ইবরাহিম (আঃ)-এর জন্য আগুন হয়ে যায় ঠান্ডা ও নিরাপদ।

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

"হে আগুন! তুমি ঠান্ডা ও নিরাপদ হয়ে যাও ইবরাহিমের জন্য।" [269]

এই অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, নবীর ধৈর্য ও আল্লাহর সাহায্য মিলিয়ে পরিশেষে বিপদে রক্ষা ও চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত হয়। ইবরাহিম (আঃ)-এর এই দৃঢ়তা ও তাওয়াক্কুল আমাদের জন্য একটি অসীম শিক্ষা, যে বিপদ বা হতাশার মধ্যেও আল্লাহর সাহায্য থাকলেই সাফল্য নিশ্চিত। [270]

---

[268] কাসাসুল আম্বিয়া, তাফসির ইবন কাসির

[269] সূরা আল-আনবিয়া, আয়াত ৬৯

[270] তাফসির ইবন কাসির; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ১

হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে ফেরাউনের কাছে দাওয়াত দিতে যান। কিন্তু ফেরাউন এবং তার সৈন্যরা অত্যন্ত অহংকারী ও শক্তিশালী ছিলেন। তিনি মানুষের অবিশ্বাস, জাদুকরের প্রতিযোগিতা এবং ফেরাউনের কঠোরতার কারণে কিছুটা হতাশা অনুভব করলেন। মনে হচ্ছিল এভাবে কি তিনি তাঁর জাতিকে আল্লাহর পথে আনতে সক্ষম হবেন?

তবুও, আল্লাহর সাহায্য অব্যাহত ছিল। তাঁর নির্দেশে মূসা (আঃ) লাঠি দিয়ে সমুদ্রের পানি ভাগ করলেন, এবং বনি ইসরাঈল নিরাপদভাবে পার পেয়েছিল। ফেরাউন ও তাঁর সৈন্যেরা সেই পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হল।

فَفَجَّرْنَا ٱلْبَحْرَ فَٱنْفَلَقَ فَٱسْتَغْرَقَ ٱلْجَمْعُ كُلَّهُمْ

"আমরা সমুদ্রকে ভাগ করলাম; সমস্ত দুষ্ট সৈন্য নিমজ্জিত হল।" [271]

এই ঘটনায় প্রকাশ পায়, নবীদের সাময়িক হতাশা কখনও চূড়ান্ত ব্যর্থতা নয়। আল্লাহর সাহায্য ও নবীর ধৈর্য মিলিয়ে বিপদে রক্ষা ও চূড়ান্ত সাফল্য নিশ্চিত হয়। [272]

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কার কুরাইশদের কাছে আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছিলেন, তখন তাঁকে ভয়, উপহাস ও নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয়। কুরাইশরা হাস্যকর উপায়ে তাঁকে উপেক্ষা করত, অসম্মান করত এবং কখনও কখনও শারীরিক নির্যাতনের চেষ্টা করত।

একটি বিশেষ ঘটনা ছিল তায়েফে - সেখানে নবীজী ﷺ কে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান ও নির্যাতন করা হয়। মানুষ হতাশ করার চেষ্টা করলেও, তিনি হতাশ হননি। বরং তাঁর অন্তরে ছিল অটল ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা। আল্লাহ তাঁকে ধৈর্য ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে আশ্বস্ত করেছেন, এবং নবীজী ﷺ-এর দাওয়াত অব্যাহত রইল।

শেষ পর্যন্ত, ইসলামের বিজয় আসে। কুরআন নাজিল হয়, মানুষ আল্লাহর পথে আসে, এবং নবীজী ﷺ-এর ধৈর্য, সহনশীলতা ও সঠিক দাওয়াতের কৌশল সফল হয়। এই ঘটনা আমাদের শেখায় সাময়িক ব্যর্থতা বা হতাশা চূড়ান্ত সাফল্যকে আটকাতে পারে না, যদি আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকে। [273]

---

[271] সূরা আশ-শুআরা, আয়াত ৬০

[272] কাসাসুল আম্বিয়া, তাফসির তাবারী

[273] সীরাত ইবন হিশাম; তাফসির ইবন কাসির

দাওয়াত দানে নবীদের বিশেষ সিফাত (গুণাবলি)

নবীদের দাওয়াতের সফলতার পেছনে যে বিশেষ সিফাত বা গুণাবলি ছিল, তা কেবল তাদের ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ ও উৎকর্ষপূর্ণ করেছিলই না, বরং মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর পথে আহ্বান পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এক অপরিসীম প্রভাব ফেলেছিল। নবীরা ছিলেন আল্লাহর নির্বাচিত দূত, যারা মানবজাতিকে নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিকভাবে উন্নত করার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তাদের দাওয়াত কেবল শব্দের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ থাকত না; এটি ছিল পুরো ব্যক্তিত্ব, চরিত্র এবং জীবনযাপনের প্রতিফলন।

নবীদের চরিত্রে যে গুণাবলি ছিল, তা ছিল তাদের দাওয়াতকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার মূল ভিত্তি। এই গুণাবলিগুলো ছিল-

- **বিশুদ্ধ নিয়ত**

নিয়ত হলো মানুষের হৃদয়ের অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য, যা কোনো কাজ করার আগে সেটির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ইসলামে কাজের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে নিয়তের সঠিকতা ও বিশুদ্ধতার উপর। কোরআন ও হাদিসে বারবার জোর দেওয়া হয়েছে যে কোনো কাজ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা উচিত।

নবীরা যখন মানুষের প্রতি দাওয়াত দিতেন, তাদের নিয়ত ছিল শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। তাদের লক্ষ্য ছিল মানুষকে সত্যের পথে নিয়ে আসা, নিজের সম্মান, ক্ষমতা বা ধন-সম্পদ নয়।

কাসাসুল আম্বিয়া থেকে উদাহরণ:

হযরত নূহ (আঃ) প্রায় ৯৫০ বছর তার সম্প্রদায়কে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তার দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে আল্লাহর ইবাদতে আহ্বান করা, কোন স্বার্থ বা স্বীকৃতি নয়।

হযরত নূহ (আঃ) তার দাওয়াতের মাধ্যমে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি চেয়েছিলেন।

নবীরা যখন মানুষের প্রতি দাওয়াত দিতেন, তাদের নিয়ত ছিল শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। তাদের লক্ষ্য ছিল মানুষকে সত্যের পথে নিয়ে আসা, নিজের সম্মান, ক্ষমতা বা ধন-সম্পদ নয়। হযরত নূহ (আঃ) প্রায় ৯৫০ বছর তার সম্প্রদায়কে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তার দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে আল্লাহর ইবাদতে আহ্বান করা, কোন স্বার্থ বা স্বীকৃতি নয়। হযরত নূহ (আঃ) তার দাওয়াতের মাধ্যমে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি চেয়েছিলেন।

নবীরা জানতেন, মানুষের গ্রহণ বা অগ্রহণ তাদের নিয়তকে প্রভাবিত করবে না। তাদের দাওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী, মানুষের প্রতিক্রিয়ার ওপর নয়।

হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তিনি জানতেন তাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে। তবুও তার দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। হযরত মূসা (আঃ) প্রতিটি কথায় আল্লাহর সন্তুষ্টি চেয়েছিলেন।

নবীদের দাওয়াতের সফলতা তাদের বিশুদ্ধ নিয়ত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য দ্বারা সুদৃঢ় ছিল। তারা দাওয়াতের সময় কখনও ব্যক্তিগত স্বার্থ বা সম্মানকে প্রধান্য দেননি। তাই নবীদের দাওয়াত আজও মানবজাতির জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার অনন্য দৃষ্টান্ত।

❖ **দয়া**

দয়া মূলত এমন একটি গুণ, যা মানুষকে সহানুভূতি, মমত্ববোধ এবং করুণা প্রদর্শনের মাধ্যমে অন্যের উপকারে উৎসাহিত করে। নবীদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে দয়া ছিল তাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তারা কেবল শক্তিশালী বক্তব্য বা হুমকি দিয়ে দাওয়াত দিতেন না, বরং দয়া, কোমলতা এবং করুণা সহকারে মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা জাগিয়েছেন।

দয়া নবীদের দাওয়াতকে ফলপ্রসূ করেছিল। মানুষের মনোমুগ্ধকর দয়া দেখার মাধ্যমে তারা স্বাভাবিকভাবে শুনতে এবং শেখার জন্য উন্মুক্ত হতো। কঠোর শাসক বা বিদ্রোহী মানুষদের সাথে দয়া প্রদর্শন করা তাদের বাধা কমাতো এবং ঈমান আনার সম্ভাবনা বাড়াত।

নবীরা দয়া এবং কোমলতা দিয়ে দাওয়াত দিতেন। তাদের দয়া ছিল মানবতার প্রতি প্রেম, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত এবং মানুষের হৃদয়ে পরিবর্তন আনার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এই দয়া তাদের দাওয়াতকে শুধুমাত্র সামাজিক এবং নৈতিকভাবে প্রভাবশালী করত না, বরং আল্লাহর রাহমতও তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিত।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর দাওয়াত শুরু করেছিলেন মক্কায়, যেখানে চারপাশে অস্থিরতা, কষ্ট এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। সেই সময়ও তিনি কখনো রাগান্বিত বা কঠোর হয়ে মানুষকে আহ্বান করেননি। বরং নবী ﷺ মানুষের প্রতি দয়া দেখাতেন। তাদের ভুল বোঝাপড়া বা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কোমল ভাষা এবং উদাহরণ দিয়ে বোঝাতেন।

তিনি সাধারণ মানুষের মতোই ছিলেন, কখনো উচ্চবাচ্য দেখাতেন না। মানুষের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতেন, যাতে তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। যারা ভুল পথে চলছিল, তাদের সঙ্গে তিনি নম্রভাবে আচরণ করতেন এবং জীবনের বাস্তব উদাহরণ দিয়ে দেখাতেন আল্লাহর পথে চলার গুরুত্ব। এই কোমলতা এবং দয়া মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস জাগাতে সাহায্য করেছিল। এর ফলে অনেক মানুষ ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল এবং ঈমান আনেছিল।[274]

হযরত নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর ধরে তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন। তিনি কখনো রাগ বা ঘৃণা দেখাতেন না। মানুষের বিদ্রূপ ও অবিশ্বাসের মধ্যেও ধৈর্য সহকারে দাওয়াত চালিয়ে যেতেন। তার দয়া এবং ধৈর্যের কারণে অল্প সংখ্যক মানুষও ঈমান আনেছিল।

হযরত হুদ (আঃ) আদ সম্প্রদায়কে দাওয়াত দিতেন। তিনি সতর্ক এবং কোমল ভাষায় আল্লাহর একত্ব ও ভয় বোঝাতেন। কঠোর শাসক এবং বিদ্রোহী মানুষের মধ্যেও তিনি দয়া দেখাতেন। এই কোমল দাওয়াতের কারণে কিছু মানুষ তাঁর আহ্বান মেনে চলেছিল।

হযরত সুলাইমান (আঃ) তাঁর সাম্রাজ্য এবং রাজত্বের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দয়া ও ন্যায়ের মাধ্যমে মানুষকে দাওয়াত দিতেন। তিনি কখনো শাসনের শক্তি দেখিয়ে মানুষকে বাধ্য করতেন না। বরং ন্যায় এবং দয়া প্রদর্শন করে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতেন। প্রজাদের প্রতি করুণা দেখানোর মাধ্যমে তাদেরকে ঈমানের প্রতি আকৃষ্ট করতেন।

হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনের শাসনামলে মানুষের দিকে দাওয়াত দিতেন। তিনি কোমলভাবে এবং ধৈর্য সহকারে আল্লাহর বার্তা প্রচার করতেন। কঠোর শাসক ফেরাউনের প্রতি ধৈর্য ধরে দাওয়াত চালাতেন। মানুষের ভয়, শঙ্কা এবং অবিশ্বাসের মধ্যেও দয়া প্রদর্শন করতেন।

নবীগণ সবসময় দয়া, কোমলতা ও করুণার মাধ্যমে দাওয়াত দিয়েছেন। যা কঠোর বা হুমকিপূর্ণ দাওয়াতের চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসূ।[275]

---

[274]কাসাসুল আম্বিয়া

[275] কাসাসুল আম্বিয়া ; বিদায়া আন নিহায়া

❖ **নত দৃষ্টি**

দৃষ্টি ২ ধরনের

- সুদৃষ্টি
- কুদৃষ্টি

কুদৃষ্টি একটি কবিরা গুনাহ। এই পাপ থেকে সৃষ্টি হয় বদ আমলের যার প্রভাব পড়ে অন্তরে। তখন কারো সাথে অন্তর্ভুক্ত এর ভাষায় কথা বলা যায় না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। তিনি পবিত্রদের ভালবাসেন, পবিত্র অন্তর ভালোবাসেন। যখন ব্যক্তির অন্তর কলুষিত থাকবে তখন তার মুখের জবান দ্বারা কাউকে দাওয়াত দেওয়া যায় না। কুদৃষ্টি দ্বারা অন্তরে তারা লেগে যায়। দাওয়াতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি অন্তরের ভাসায় কথা বলা। অন্তর দিয়ে দয়া দিয়ে মায়া দিয়ে আল্লাহর পথে ডাকতে না পারলে দাওয়াত দেওয়া যায় না।

মানবদেহের জানালা হলো চোখ, আর হৃদয় হলো তার রাজপ্রাসাদ। চোখের দৃষ্টি যদি কলুষিত হয়, তবে অন্তরও অশুদ্ধ হয়ে যায়। এই জন্যই নবীগণ তাদের দৃষ্টি সর্বদা সংযত রাখতেন কারণ তারা জানতেন,

অন্তরের পবিত্রতা ছাড়া দাওয়াতের কথা অন্তরে প্রবেশ করে না। "যে ব্যক্তি আত্মাকে পবিত্র করেছে, সে সফল; আর যে কলুষিত করেছে, সে ব্যর্থ।"

অর্থাৎ "অন্তরের পবিত্রতা দ্বারা বোঝানো হয়েছে তাকওয়া ও দৃষ্টির সংযম।"[276]

কুদৃষ্টি (বদদৃষ্টি, অশুদ্ধ দৃষ্টি) ইসলামে একটি কবিরা গুনাহ। এই দৃষ্টিই অন্তরে বদ আমল ও হিংসা সৃষ্টি করে, যার প্রভাবে হৃদয় কঠিন ও অন্ধ হয়ে যায়। তখন আল্লাহর কথা, দাওয়াতের আহ্বান কিছুই হৃদয়ে স্থান পায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে ও লজ্জাস্থান রক্ষা করে; এটি তাদের জন্য অধিক পবিত্র।"

"দৃষ্টি সংযম অন্তরের পবিত্রতা বৃদ্ধি করে, আর কুদৃষ্টি তা কলুষিত করে।"[277]

নবীগণ ছিলেন দৃষ্টিতে নত, অন্তরে উজ্জ্বল। তাদের দৃষ্টির পবিত্রতা ছিল অন্তরের আলোকিত রূপের প্রকাশ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃষ্টি সম্পর্কে সাহাবি হিন্দ ইবন আবি হালা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন -

"كَانَ نَظَرُهُ إِلَى الْأَرْضِ أَطْوَلَ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، جُلُّ نَظَرِهِ الْمُلَاحَظَةُ."

"তার দৃষ্টি ছিল সর্বদা নিচের দিকে; আকাশের তুলনায় মাটির দিকে বেশি তাকাতেন। তিনি কখনো পূর্ণ দৃষ্টিতে কারো দিকে তাকাতেন না।"[278]

এ দৃষ্টির নম্রতা তাঁর অন্তরের বিনয় ও দয়ার প্রতিফলন। "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃষ্টি ছিল সংযত, তাঁর অন্তর ছিল দয়ার সমুদ্র। তাঁর দৃষ্টি মানুষকে লজ্জা ও আল্লাহভীতির শিক্ষা দিত।"[279]

[276] ইবনে কাসীর, তাফসির আশ-শামস, ৯–১০

[277] আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, সূরা আন-নূর, আয়াত ৩০

[278] শামায়েল তিরমিজি, হাদীস: ৩

[279] বিদায়া আন নিহায়া, ইবনে কাসীর

নবীদের দাওয়াত সফল হতো কারণ তাঁদের অন্তর ছিল পবিত্র, দয়ায় ভরা। যার অন্তরে ঈমানের আলো থাকে না, সে মুখে যতই ভালো কথা বলুক না কেন, তার কথা মানুষের অন্তরে প্রভাব ফেলতে পারে না।

সব নবীর দাওয়াতের ভিত্তি ছিল অন্তরের দয়া, সংযত দৃষ্টি ও পবিত্র নিয়ত।দাওয়াত শুধুমাত্র মুখের কথা নয়; এটি অন্তরের অবস্থা ও দৃষ্টির পবিত্রতার প্রতিফলন। যে নবীরা অন্তরে দয়া ধারণ করে, সংযত দৃষ্টি রাখে, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দাওয়াত দেন। তাদের দাওয়াত মানুষের অন্তরে স্থান পায়। নবীদের দাওয়াত মানুষের জীবন আলোকিত করেছিল।

- **সর্বদা পরকালের চিন্তা করা**

মানবজীবনের পরম লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতে সফলতা লাভ করা। এই উদ্দেশ্যই ছিল সকল নবী-রাসূলের দাওয়াত ও জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। নবীগণ ছিলেন আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা, যাঁরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি অতিমাত্রায় আগ্রহী ছিলেন না; বরং তাঁরা সর্বদা পরকালের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তাঁদের অন্তর পরকালের জবাবদিহি, জান্নাত ও জাহান্নামের বাস্তবতা নিয়ে সদা সতর্ক ও মনোযোগী থাকত।

নবীদের এই আখিরাতমুখী চেতনা ছিল তাঁদের দাওয়াতি জীবনের মূল প্রেরণা। তাঁরা মানুষকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিতেন - এই পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়; বরং এটি একটি পরীক্ষার স্থান। আল্লাহর রাসূলগণ তাঁদের আমল, আখলাক ও দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে আখিরাতের ভাব জাগিয়ে তুলতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনে পরকাল চিন্তা ছিল এক অবিচ্ছেদ্য সিফাত (গুণ)। হযরত হিন্দ ইবনে আবি হালা রা. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ، دَائِمَ الْفِكْرِ، لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ."

অর্থাৎ, "রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা দুঃখিত থাকতেন (দুনিয়ার নয়, বরং উম্মতের এবং পরকালের চিন্তায়), তাঁর চিন্তা সর্বদা অব্যাহত থাকত; তাঁর আরাম বা অবসর ছিল না।" [280]

এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, নবী ﷺ এর হৃদয় সর্বদা আখিরাতের চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। তিনি দুনিয়ার সাজ-সজ্জা বা বিলাসে মগ্ন হতেন না; বরং সর্বদা আল্লাহর সাক্ষাতের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ الْأَمَانِيَّ."

অর্থাৎ, "বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য আমল করে; আর মূর্খ সেই ব্যক্তি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং শুধু আল্লাহর উপর অবাস্তব আশা রাখে।"[281]

এই হাদীস নবীদের চিন্তাধারার প্রতিফলন। তাঁরা মানুষকে দুনিয়ার মোহ থেকে দূরে রেখে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান করেছেন।

---

[280] শামাইলু মুহাম্মাদিয়া, ইমাম তিরমিযী, হাদিস: ৩৫

[281] সুনান তিরমিযী, হাদিস: ২৪৫৯

নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে সতর্ক করে বলেছিলেন,

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

"নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক মহান দিনের (আখিরাতের) শাস্তি আশঙ্কা করছি।"[282]

ইবরাহিম (আঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন,

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ

"যেদিন মানুষ পুনরুত্থিত হবে, সেদিন তুমি আমাকে লাঞ্ছিত করো না।"[283]

এগুলোই প্রমাণ করে যে, সকল নবীই আখিরাতের চিন্তায় সর্বদা ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা নিজেরাও ভয় করতেন এবং উম্মতকেও সতর্ক করতেন।

পরকালের চিন্তা একজন মুমিনের জীবনে আত্মশুদ্ধি ও আমলের প্রেরণা জাগায়। নবীগণ এই চিন্তাকে হৃদয়ে ধারণ করে জীবন পরিচালনা করেছেন। তাঁদের উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদেরও উচিত দুনিয়ার অস্থায়ী সুখে নিমগ্ন না হয়ে আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কেননা, আখিরাতই হলো চিরস্থায়ী জীবনের সূচনা।

- **উম্মতের ফিকির ও দরদ**

নবী-রাসূলগণ ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত শ্রেষ্ঠ বান্দাগণ। তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উম্মতের কল্যাণ, হিদায়াত ও মুক্তির চিন্তায় নিবেদিত ছিল। তাঁরা কখনো নিজেদের জন্য নয়, বরং মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্যই জীবন উৎসর্গ করেছেন। এই উম্মতের ফিকির বা চিন্তা ছিল আল্লাহ তাআলার নিকট অত্যন্ত প্রিয় একটি সিফাত।

প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতের জন্য দুঃখ ও চিন্তায় ব্যাকুল থাকতেন। তাঁদের হৃদয় উম্মতের পথভ্রষ্টতা ও অবাধ্যতা দেখে কাঁদত, আর তাঁরা আল্লাহর দরবারে তাঁদের জন্য ক্ষমা চাইতেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বহু নবীর উম্মতের প্রতি দরদ ও মমত্বের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।

হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে শত শত বছর আহ্বান করেছেন শুধুমাত্র তাদের মুক্তির জন্য।

رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا

"হে আমার প্রভু! আমি আমার জাতিকে দিন-রাত আহ্বান করেছি।" [284]

হযরত ইবরাহিম (আঃ) নিজের পরবর্তী প্রজন্মের হিদায়াতের জন্য দোয়া করেছেন,

---

[282] সূরা হুদ, আয়াত: ২৬

[283] সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত: ৮৭

[284] সূরা নূহ, আয়াত: ৫

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

"হে আমার প্রভু! আমাকে ও আমার সন্তানদের সালাত কায়েমকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো।"[285]

হযরত দাউদ (আঃ) ও সুলাইমান (আঃ) এর জীবনে আমরা দেখি - তাঁরা শুধু রাজা ছিলেন না, বরং জনগণের কল্যাণের চিন্তায় সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের সর্বাধিক দরদী নবী ছিলেন।

সকল নবীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সর্বাধিক উম্মতের ফিকিরে মগ্ন। তাঁর হৃদয় উম্মতের দুঃখে কাঁদত, তাঁদের পথভ্রষ্টতা তাঁকে ব্যথিত করত। হযরত হিন্দ ইবনে আবি হালা রা. বলেন,

"রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন।"[286]

এই চিন্তা কেবল দুনিয়াবি ছিল না, বরং উম্মতের আখিরাতের মুক্তি নিয়ে ছিল। তাঁর চোখে অশ্রু ঝরত, হৃদয় কেঁদে উঠত উম্মতের অবস্থা ভেবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই গভীর ফিকিরের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন,

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

অর্থঃ তারা বিশ্বাস করে না বলে আপনি হয়তো মর্মব্যথায় আত্নঘাতী হবেন। [287]

আরেক স্থানে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"তোমাদের মধ্য থেকেই এমন এক রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের কষ্টকে নিজের জন্যও কষ্ট মনে করেন। তিনি তোমাদের মঙ্গলে অত্যন্ত আগ্রহী, আর মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময়।"[288]

এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে নবী ﷺ উম্মতের জন্য কেবল শিক্ষক বা নেতা ছিলেন না; তিনি ছিলেন এক অতুলনীয় দয়াময় অভিভাবক, যাঁর হৃদয় সদা উম্মতের কল্যাণে ব্যাকুল থাকত।

❖ আরামপ্রিয় না হওয়া

নবী–রাসূলগণ ছিলেন আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত বান্দা, যাঁদের জীবন ছিল দাওয়াত, ত্যাগ ও পরিশ্রমে পরিপূর্ণ। তাঁরা কখনো বিলাসিতা বা আরামপ্রিয় জীবন পছন্দ করেননি। কারণ, দাওয়াতের কাজ আরাম ও অলসতার সঙ্গে একত্র হতে পারে না। যিনি আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করবেন, তাঁকে অবশ্যই সংগ্রামী, ধৈর্যশীল ও পরিশ্রমী হতে হবে। এ সত্য নবীগণের জীবন থেকেই সর্বোত্তমভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

---

[285] সূরা ইবরাহিম, আয়াত: ৪০

[286] শামাইলু মুহাম্মাদিয়া, ইমাম তিরমিযী, হাদিস: ৩৫

[287] আশ শুআরা - ৩

[288] সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১২৮

আরামপ্রিয়তা দাওয়াতের পথে বাধা। দাওয়াতের কাজ মানেই কষ্ট, পরিশ্রম ও ত্যাগ।

আরামপ্রিয়তা মানুষকে দায়িত্বহীন করে তোলে, ত্যাগের মনোভাব নষ্ট করে এবং আত্মতুষ্টির দিকে ধাবিত করে। এজন্য নবী–রাসূলগণ সর্বদা তাঁদের অনুসারীদের সতর্ক করতেন যেন তারা আরামপ্রিয় না হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে ছিলেন দুনিয়ার সকল প্রকার বিলাসিতা থেকে দূরে। তিনি সহজ জীবনযাপন করতেন, কখনো নরম বিছানা বা বিলাসী ঘুম পছন্দ করতেন না। তাঁর পুরো জীবন ছিল কষ্ট, ধৈর্য ও পরিশ্রমে ভরা।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, "রসূলুল্লাহ ﷺ কখনো দুই দিন পেটভরে আহার করেননি। তিনি ক্ষুধা সহ্য করতেন, যেন উম্মতের দরিদ্ররা অনুপ্রাণিত হয়।"[289]

আরেক বর্ণনায় আসে- "নবী ﷺ এর বিছানা ছিল চামড়ার তৈরি, যার ভিতরে ছিল খেজুর গাছের শুকনো পাতা।"[290]

এমনকি নবী ﷺ একবার দীর্ঘ দিন পরে বিশ্রাম নিতে চাইলেন, তখন তাঁর শরীরের নিচে থাকা চাটাইয়ের দাগ পিঠে লেগে গিয়েছিল। সাহাবীগণ বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, আপনি একটু আরাম করুন।" তখন নবী ﷺ বলেছিলেন, "দুনিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্কই বা কী? আমি তো দুনিয়ায় এমন এক পথিক, যে কিছুক্ষণ গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিয়ে পরে চলে যায়।"[291]

এই হাদীস নবী ﷺ ছিলেন দুনিয়ার আরাম ও বিলাসিতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, সর্বদা আল্লাহর কাজে নিবেদিত।

নবী ﷺ-এর সাহাবাদের আরামপ্রিয়তা থেকে বিরত করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু নিজেই ত্যাগী জীবনযাপন করেননি, বরং তাঁর সাহাবাদেরও একই চেতনায় গড়ে তুলেছিলেন। তিনি তাঁদের আরামপ্রিয়তা থেকে দূরে থাকতে শিখিয়েছেন। একবার সাহাবীরা যুদ্ধ শেষে নরম বিছানা ও আরামদায়ক কাপড় ব্যবহারের ইচ্ছা প্রকাশ করলে নবী ﷺ বলেছিলেন,

"সতর্ক হও! তোমরা যদি বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশে লিপ্ত হও, তাহলে পূর্ববর্তী জাতির মতো দুর্বল হয়ে পড়বে।"[292]

তিনি উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, দাওয়াতের পথে সংগ্রাম, কষ্ট ও পরিশ্রমই হলো প্রকৃত সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

আরামপ্রিয়তা কখনোই নবীদের স্বভাব ছিল না। তাঁরা জানতেন দাওয়াতের কাজ ত্যাগ, ধৈর্য ও আত্মসংযম ছাড়া সম্ভব নয়। নবী ﷺ এর জীবন আমাদের শেখায়, আরাম ও বিলাসিতা নয়, বরং আত্মত্যাগ ও পরিশ্রমই আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ।

❖ অধিকাংশ সময় চুপ থাকা

নবী-রাসূলদের অন্যতম একটি গুণ ছিল অধিকাংশ সময় চুপ থাকা। চুপ থাকা তাদের জ্ঞান, ধৈর্য ও চিন্তাশক্তির প্রতিফলন ঘটায়। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় চুপ থাকতেন। তিনি বলেছেন , "যে চুপ থাকে, সে নাজাত পায়।"[293]

---

[289] সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৪৫৯

[290] সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৪৫৬

[291] সুনান তিরমিযী, হাদীস: ২৩৭৭

[292] মুসনাদে আহমদ, হাদীস: ২৩১৩৪

[293] তিরমিজি

চুপ থাকা মানুষকে গভীর চিন্তাশীল করে তোলে; এতে মনোসংযোগ বৃদ্ধি পায়, আত্মনিয়ন্ত্রণ সহজ হয় এবং আল্লাহর জিকিরে মনোযোগী হওয়া যায়।

হযরত হিন্দ ইবন আবি হালা (রা:) বর্ণনা করেছেন , ‘‘রসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ সময় চুপ থাকতেন। তিনি অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না।’’[294]

❖ সারগর্ভ ভাষায় কথা বলা

নবী-রাসূলদের অন্যতম গুণ ছিল সারগর্ভ ভাষায় কথা বলা। তাঁরা অল্প কথায় গভীর অর্থ প্রকাশ করতেন, যাতে শ্রোতার অন্তরে সরাসরি প্রভাব পড়ে।

নবী করিম ﷺ সম্পর্কে হযরত হিন্দ ইবনে আবি হালা (রা) বর্ণনা করেন , ‘‘রসূলুল্লাহ ﷺ এর কথাবার্তা ছিল স্পষ্ট, সারগর্ভ ও অর্থবহ। তাঁর কথায় অপ্রয়োজনীয় শব্দ থাকত না।’’[295]

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন , ‘‘আমাকে সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ বাক্য প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।’’[296]

নবী-রাসূলগণ এমনভাবে কথা বলতেন, যাতে অল্প শব্দেই মানুষ দিকনির্দেশনা, শিক্ষা ও প্রেরণা পেত। তাদের কথা ছিল হৃদয় ছোঁয়া, প্রভাবশালী ও বাস্তবমুখী।

❖ নরম মেজাজি হওয়া

নবী-রাসূলগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল নরম মেজাজি হওয়া। তাঁরা কখনো রূঢ় বা কঠোর আচরণ করতেন না, বরং কোমল স্বভাব, সহনশীলতা ও বিনয় দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করতেন। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন সর্বাধিক নরম মেজাজের অধিকারী। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই গুণের প্রশংসা করে বলেন ,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

‘‘(হে নবী!) আল্লাহর রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি কোমল ছিলে। যদি তুমি কঠোর ও কঠিন হৃদয়ের হতে, তবে তারা তোমার চারপাশ থেকে সরে যেত।’’[297]

নবীজির ﷺ নরম মেজাজ তাঁর দাওয়াতের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি ছিল। তিনি কখনো অপমানের প্রতিশোধ নিতেন না, বরং ধৈর্য, ক্ষমা ও ভালোবাসার মাধ্যমে মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করতেন।

[294] শামায়িল তিরমিজি

[295] শামায়িল তিরমিজি

[296] বুখারী, মুসলিম

[297] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৯

❖ **নম্রতা**

নবী-রাসূলগণের দাওয়াতি জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল নম্রতা, মহব্বত ও ভালোবাসা। তাঁরা দাওয়াতের কাজে কখনো অহংকার বা কঠোরতা প্রদর্শন করেননি, বরং বিনয়, কোমলতা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়কে জয় করতেন। নম্রতা হলো এমন এক চরিত্র, যা দাওয়াতকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। কারণ, যিনি নিজে বিনয়ী হন, তাঁর কথা মানুষের হৃদয়ে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। অহংকারী ব্যক্তির কথা মানুষের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলে না।

নম্রতা হলো দাওয়াতের প্রাণ। যেখানে বিনয় আছে, সেখানে ভালোবাসা জন্মায়; আর যেখানে ভালোবাসা আছে, সেখানে দাওয়াত গ্রহণযোগ্য হয়। নবী-রাসূলগণ তাঁদের নম্রতার মাধ্যমেই কঠিন হৃদয়কেও নরম করেছেন, এবং মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে এনেছেন।

নম্রতা নবী-রাসূলগণের দাওয়াতি জীবনের একটি মৌলিক গুণ। তাঁরা অহংকার, ক্রোধ বা কঠোরতার মাধ্যমে নয় বরং বিনয়, ধৈর্য ও কোমলতার মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন।

হযরত নূহ (আঃ) প্রায় ৯৫০ বছর তাঁর জাতিকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন, কিন্তু খুব অল্প মানুষই ঈমান এনেছিল। তবুও তিনি কখনো রাগ করেননি, হতাশ হননি, বরং বিনয় ও কোমল হৃদয়ে দাওয়াত চালিয়ে গেছেন। শত অবজ্ঞার পরেও তিনি রূঢ় হননি, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় দাওয়াত চালিয়ে গেছেন।

ইবরাহিম (আঃ) তাঁর পিতা ও জাতিকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন অত্যন্ত বিনয় ও শিষ্টাচারের সাথে। তিনি তাঁর মুশরিক পিতাকেও "হে আমার পিতা (يَا أَبَتِ)" বলে স্নেহ ও নম্রতার সাথে সম্বোধন করেছেন - এটিই দাওয়াতের আদব।

মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের মতো এক জালেম রাজাকে দাওয়াত দিতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাকেও কঠোরভাবে নয়, কোমল ভাষায় কথা বলার নির্দেশ দেন।

فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

"তোমরা তার সঙ্গে কোমলভাবে কথা বলো, যাতে সে উপদেশ গ্রহণ করে বা ভয় করে।"[298]

দাওয়াতে সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি হলো কোমলতা ও নম্রতা, এমনকি শত্রুর প্রতিও। নবী-রাসূলদের দাওয়াত সফল হয়েছে কারণ তাঁরা নম্রতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে পৌঁছেছেন। কঠোরতা মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়, কিন্তু নম্রতা আল্লাহর পথে টেনে আনে।

[298] সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৪৪

দুনিয়াবী বিষয়ে রাগান্বিত না হওয়া

নবী-রাসূলগণ ছিলেন পরিপূর্ণ ধৈর্য, ত্যাগ ও আত্মসংযমের অধিকারী। তাঁদের অন্যতম গুণ ছিল দুনিয়াবী কোনো বিষয়ে রাগান্বিত না হওয়া। নবীগণের হৃদয় দুনিয়ার ছোটখাটো অসুবিধা, প্রতারণা বা অবজ্ঞার কারণে অস্থির হত না। কারণ তাদের লক্ষ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সফলতা। তাঁরা জানতেন, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বিষয় নিয়ে রাগ করা শুধুই ক্ষয়ক্ষতি। হযরত মুহাম্মদ ﷺ এই গুণের চূড়ান্ত উদাহরণ।

হযরত হিন্দ ইবনে আবি হালা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়াবী কোনো বিষয় নিয়ে রাগান্বিত হতেন না। উনার রাগ তখনই প্রকাশ পেত যখন আল্লাহর বিধান বা আখিরাতের কোনো বিষয়ে কেউ হস্তক্ষেপ করত।" [299]

নবীজির ﷺ রাগ তখন এতই প্রকট হত যে তাঁর চেহারার রূপ পরিবর্তিত হয়ে যেত এবং কেউ তাঁকে চিনতে পারত। কিন্তু এই রাগ শুধুমাত্র ধর্মের কল্যাণ ও আখিরাতের জন্য ছিল।

হযরত নূহ (আঃ) প্রায় ৯৫০ বছর তাঁর জাতিকে দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁর প্রতি বার প্রতিশোধ, অবজ্ঞা ও ব্যঙ্গ সত্ত্বেও তিনি কখনো দুনিয়াবী রাগ প্রকাশ করেননি। শুধু তখনই রাগ দেখাতেন যখন মানুষের অবিশ্বাস ও বিদ্রোহ আল্লাহর বিধানকে ক্ষতিগ্রস্ত করত।

হযরত মূসা (আঃ) - ফিরাউন ও তার সেনাবাহিনী তার নিকট দুঃখ, অবজ্ঞা ও শোষণ করলেও তিনি দুনিয়াবী বিষয়ে রাগান্বিত হননি। শুধু তখনই ক্রোধ প্রকাশ করতেন যখন আল্লাহর বিধান ও মানুষের ন্যায়হানি বাধাগ্রস্ত হত।

وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا

"তার সঙ্গে কোমলভাবে কথা বলো, যাতে সে উপদেশ গ্রহণ করে।"[300]

নবী-রাসূলগণ সকলেই দুনিয়াবী ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে রাগান্বিত হতেন না। তাঁদের রাগ সীমিত ছিল শুধু আল্লাহর বিধান ও আখিরাতের কল্যাণের ক্ষেত্রে।

---

[299] শামায়িল তিরমিজি

[300] সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৪৪

উপসংহার

আমি এতোক্ষণ নবী ও রাসূলদের দাওয়াতের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য, পদ্ধতি, চ্যালেঞ্জ ও সফলতার উপর একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভের চেষ্টা করেছি। প্রকৃতপক্ষে নবী-রাসূলদের দাওয়াতের বিষয়বস্তু এতই ব্যাপক ও গভীর যে, তা কোনো ছোট রচনা বা সীমিত আলোচনায় সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নবী-রাসূলগণের দাওয়াত মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে স্পর্শ করেছে। তাঁরা মানুষকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছেন এবং তাওহীদের পতাকা প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। নবীদের দাওয়াত কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলেছে।

প্রতিটি নবী তাঁর নিজ জাতির ভাষায় ও বোঝার উপযোগী উপায়ে দাওয়াত প্রদান করেছেন। তাঁদের দাওয়াতে ছিল ধৈর্য, প্রজ্ঞা, সহনশীলতা ও দয়া। যেমন - হযরত নূহ (আঃ) দীর্ঘ ৯৫০ বছর ধরে ধৈর্যসহকারে দাওয়াত দিয়েছেন, হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনের মতো অত্যাচারী শাসকের সামনে নির্ভয়ে সত্য কথা বলেছেন, হযরত ঈসা (আঃ) কোমলভাবে মানুষকে সতর্ক করেছেন, এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও হিকমাহ ও ধৈর্যের সাথে দাওয়াত চালিয়ে গেছেন।

নবী-রাসূলগণের লক্ষ্য ছিল মানুষকে কুফর, শিরক ও অন্যায় থেকে মুক্ত করে আল্লাহর আনুগত্যে ফিরিয়ে আনা। তাঁরা কখনোই পার্থিব স্বার্থের জন্য দাওয়াত দেননি; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টিই ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁদের দাওয়াত শুধু মুখের কথা নয়, বরং তাঁদের জীবনাচরণেই তা প্রতিফলিত হয়েছে।

এই দাওয়াতের আদর্শ মানবতার জন্য চিরন্তন শিক্ষা। নবীরা মানুষের সামনে এমন এক জীবনব্যবস্থা উপস্থাপন করেছেন যেখানে সত্য, ন্যায়, নীতি, ধৈর্য, দয়া ও মানবতা মিলিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"

অতএব, নবীদের দাওয়াতের সারমর্ম হলো - সত্যের প্রতি দৃঢ়তা, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা এবং মানবতার প্রতি দয়া ও দায়িত্ববোধ। তাঁদের দাওয়াত কেবল ধর্মীয় নয়, বরং সামাজিক, নৈতিক ও মানবিক জীবনের প্রতিটি স্তরে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে।

সর্বোপরি, নবী-রাসূলগণের দাওয়াত আজও মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ। যদি মানুষ তাঁদের দাওয়াতের মূল শিক্ষা তাওহীদ, ন্যায় ও দয়া অনুসরণ করে, তবে এই পৃথিবী অন্যায় ও অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে সত্য ও শান্তির আবাসভূমিতে পরিণত হবে, ইনশা'আল্লাহ।

তথ্যসূত্র

কুরআন

1. আল-বাকারা: ২:১৮৬, ২:২২১, ২:৩০, ২:৩১–৩৪, ২:৩৫–৩৭, ২:৩৮–৩৯, ২:২১–২২
2. আলে ইমরান: ৩:১০৪, ৩:১১০, ১৮৫, ৩:৫০–৫১, ৪৫, ১৫৯
3. আন-নাহল: ১২৫, ৩৬, ১০৫
4. আল-আ'রাফ: ৭:১৬৪, ৭:২৬, ৭:২৭, ৭:৩১, ৭:৩৫, ৫৯, ৭৫, ৭৭, ৭:৮০
5. আল-আন'আম: ৬:৭৬, ৬:৭৯, ৬:৭৬–৭৯
6. ইউসুফ: ১০৮ (১২:১০৮), ৩৯
7. ইউনুস: ১০:২৫
8. আর-রা'দ: ১৩:৩৬
9. ফুসসিলাত: ৪১:৩৩
10. আল-আ'লা: ৮৭:১৬–১৭, ১৬–১৭
11. আল-ক্বিয়ামাহ: ৭–১০
12. নূহ: ৭১:৫–৬, ৫–৬, ২৬
13. আল-ক্বামার: ৩১, ৫৪:২৯–৩১
14. আল-আম্বিয়া: ৬৯, ৬৮, ৬৮–৬৯, ৫২, ৬, ২১:৬৮, ১০৭
15. ত্বা-হা: ২০:১১৫–১২২, ২০:১২৩, ৪৪, ২০:৯২, ২০:৯৩, ২০:৪৪
16. হুদ: ১১:৪০, ১১:৩৭–৪০, ১১:৫০, ১১:৫৭, ১১:৫৮–৬০, ১১:৬১
17. আনকাবুত: ১৭
18. আল-ইখলাস: ১
19. ইবরাহিম: ৪০
20. মরিয়ম: ১৯:৩০–৩১, ১৯:৪৪, ৫৪–৫৫
21. আন-নিসা: ৪:৬৪
22. আশ-শূরা: ৪২:১১
23. আশ-শু'আরা: ২৬:১৬১, ৮৭, ২৬:৩৪–৩৫, ৩
24. শুআরা: ৬০
25. আস-সাফফাত: ৩৭:১৫
26. আত-তাওবা: ১২৮
27. আল-কলম: ৪

তাফসির তাবারী

1. সূরা আল-বাক্বারা:২
2. খণ্ড ৮, পৃ. ৫৬৭
3. খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৭৯
4. জামে' আল-বায়ান, ৭:২৭

তাফসির কুরতুবি

1. খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৩৪
2. সূরা আন-নূর ৩০
3. সূরা ত্বাহা ৪৪ ব্যাখ্যা

অন্যান্য তাফসির

1. আল-জালালাইন: সূরা আলে-ইমরান:১৮৫
2. মাফরুল কুরআন (খণ্ড ৮, পৃ. ৪৮২–৪৮৩)

হাদীস

1. সহিহ বুখারী: ৩৭০১, ৩৪৬১, ৬০২৯, ৪৬৮৪, ২৯৩১, ৪৫৬৩, ৬৪৫৯, ৬৪৫৬
2. সহিহ মুসলিম: ২৪০৬, ২৬৭৪
3. তিরমিযি: ২১৬৯, ২৪৫৯, ২৩৭৭,
4. মুসনাদ আহমদ: ১০৪১০, ২৩১৩৪
5. আল-মুজাম আল-কবীর (তাবারানী)

সীরাত বই

1. কাসাসুল আম্বিয়া – ইবন কাসীর
2. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া – ইবন কাসীর
3. সীরাত ইবন হিশাম / আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ
4. আর-রাহীকুল মাখতূম

অন্যান্য ইসলামী গ্রন্থ

1. মাজমু আল ফাতওয়া, ২৮:২৩১
2. জাদ আল মাআদ, ১:৬৯
3. আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা ১/৯০
4. ইহইয়া উলুমুদ্দীন
5. মাদারিজুস সালিকিন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭৯
6. মাদারিজুস সালিকিন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২১৭
7. আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবী, ৭:২৬
8. শামায়েল মুহাম্মাদিয়া (তিরমিযী)
9. সুনান তিরমিযী
10. তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক (তাবারী), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৮–১০২